স্কয়ার

স্বাস্থ্য এবং ওষুধ বিষয়ক সাময়িকী

১৬ তম
বর্ষ ২০১৪

- ডায়াবেটিসের জটিলতা
- স্ট্রোক
- সাপে কাটা
- কোষ্ঠকাঠিন্য
- টিকাদান কর্মসূচি
- শিশুদের রক্তস্বল্পতা

ISSN 1682-0541

স্কয়ার
ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিমিটেড
বাংলাদেশ

CERTIFIED ISO 9001 COMPANY

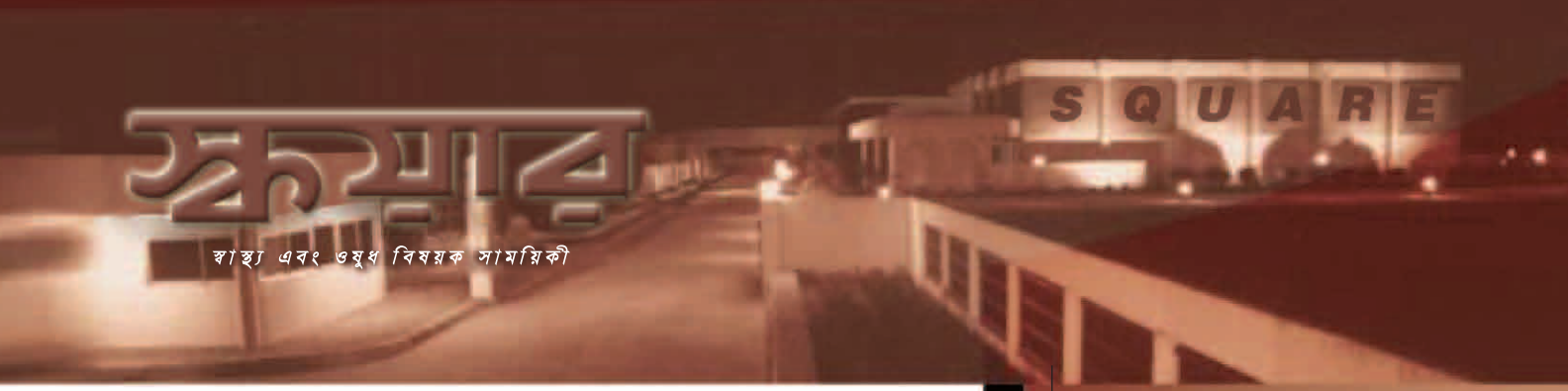

সূচি

১৬তম বর্ষ, ২০১৪

ডায়াবেটিসের জটিলতা	.....	০১
স্ট্রোক	.....	০৩
সাপে কাটা	.....	০৬
কোষ্ঠকাঠিন্য	.....	১০
টিকাদান কর্মসূচি	.....	১১
শিশুদের রক্তস্বল্পতা	.....	১৫
ওষুধের ব্যবহার ও বিধি-নিষেধ	.....	১৬

সম্পাদকীয়

সুপ্রিয় পাঠকবৃন্দ,

আপনাদের প্রিয় স্বাস্থ্য ও ওষুধ বিষয়ক সাময়িকী "*স্কয়ার*" এর বর্তমান সংখ্যাটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত। বরাবরের মত এ সংখ্যায় রয়েছে বেশ কিছু প্রয়োজনীয় এবং চমকপ্রদ সংযোজন। আমরা মনে করি সব বিষয়গুলো আপনাদের ভালো লাগবে এবং কাজে আসবে।

আপনাদের বিভিন্ন সময়ে পাঠানো মতামতের ভিত্তিতে এবং বর্তমান স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বিবেচনা করে আমরা এ সংখ্যায় বিভিন্ন তথ্য সংযোজন করেছি। ভবিষ্যতে আপনাদের সুচিন্তিত মতামত বাংলা "*স্কয়ার*" এর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি করতে সহায়তা করবে বলে আমরা আশা রাখি।

পরিশেষে, "*স্কয়ার*" পরিবারের পক্ষ থেকে আপনাদের এবং আপনাদের পরিবারের সকলের সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ কামনা করছি।

ডাঃ ওমর আকরাম-উর রব

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
ডাঃ ওমর আকরাম-উর রব

নির্বাহী সম্পাদক
ডাঃ মোঃ মাহফুজুর রহমান সিকদার

সহযোগী সম্পাদকমন্ডলী
ডাঃ এ এস এম শওকত আলী
ডাঃ মোঃ মোসাদ্দেক হোসাইন
ডাঃ মোঃ শাহরিয়ার কবির রবিন
ডাঃ মোঃ আনোয়ারুল আবেদীন

সহযোগিতায়
প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট

ISSN 1682-0541
Key title: Skayara

ডায়াবেটিসের জটিলতা

ডায়াবেটিস (Diabetes mellitus) একটি অতি পরিচিত রোগ। শরীরে ইনসুলিনের অভাব হলে বা ইনসুলিনের কার্যকারিতা হ্রাস পেলে এই রোগ হয়। এই রোগে রক্তে শর্করার পরিমাণ স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে বেড়ে যায়। বর্তমানে সারা পৃথিবীতে প্রায় ৩৮ কোটি লোক এই রোগে আক্রান্ত।

ডায়াবেটিসের কারণ সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে পারিবারিক ইতিহাস, জীবন-যাপন পদ্ধতি, পরিবেশগত কারণ, কিছু জিনের অস্বাভাবিকতা, বিভিন্ন ঔষধ (স্টেরয়েড, থায়াজাইড, নন-সিলেক্টিভ বিটা-ব্লকার, স্ট্যাটিন, অ্যাটিপিক্যাল অ্যান্টিসাইকোটিক) ইত্যাদি ডায়াবেটিসের সাথে জড়িত। ডায়াবেটিস মূলত দুই প্রকার ঃ টাইপ-১ এবং টাইপ-২। টাইপ-১ ডায়াবেটিসে অগ্ন্যাশয় হতে ইনসুলিন নিঃসরণ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে টাইপ-১ ডায়াবেটিসের রোগীর জীবন বাঁচানোর জন্য বাইরে থেকে ইনসুলিন প্রয়োগ করা অপরিহার্য। টাইপ-২ ডায়াবেটিসের রোগীর শরীরে ইনসুলিন থাকলেও শরীর তা ব্যবহার করতে পারে না। তবে দীর্ঘদিন অনিয়ন্ত্রিত টাইপ-২ ডায়াবেটিসের রোগীর অগ্ন্যাশয় ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ফলে তাদেরও ইনসুলিনের প্রয়োজন হয়। এছাড়া গর্ভাবস্থায়ও অনেক মহিলা ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হতে পারে।

ডায়াবেটিস যদি দীর্ঘদিন অনিয়ন্ত্রিত থাকে তাহলে বিভিন্ন শারীরিক জটিলতা দেখা দেয়। এসব জটিলতাকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়- স্বল্পমেয়াদী জটিলতা ও দীর্ঘমেয়াদী জটিলতা। প্রতি বছর লাখ লাখ ডায়াবেটিস রোগী এসব জটিলতায় মারা যায়।

স্বল্পমেয়াদী জটিলতা

ডায়াবেটিস রোগীর শরীরে বিপাক ক্রিয়ার তাৎক্ষণিক তারতম্য, শরীরের বিভিন্ন স্থানে সংক্রমণ, ডায়াবেটিসের ওষুধ খাওয়ায় অনিয়ম ইত্যাদি কারণে এই জটিলতাগুলো অল্প সময়ের মধ্যেই দেখা দেয়। এসব জটিলতার মধ্যে হাইপোগ্লাইসেমিয়া, ডায়াবেটিক কিটোএসিডোসিস, হাইপার-অসমোলার নন-কিটোটিক কোমা ইত্যাদি প্রধান।

ক) হাইপোগ্লাইসেমিয়াঃ

রক্তে শর্করার মাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে কমে গেলে (< 70 mg/dL বা 3.9 mmo/L) তাকে হাইপোগ্লাইসেমিয়া বলে। বিভিন্ন কারণে এই শারীরিক অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। প্রধানত সময়মত না খাওয়া বা অপর্যাপ্ত খাওয়া, স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি মাত্রায় ইনসুলিন নেওয়া বা ডায়াবেটিসের ওষুধ খাওয়া, ইনসুলিন বা ডায়াবেটিসের ওষুধ খেয়ে অনেকক্ষণ না খেয়ে থাকা, অতিরিক্তি মদ্যপান করা ইত্যাদি কারণেই হাইপোগ্লাইসেমিয়া হয়।

হাইপোগ্লাইসেমিয়ার লক্ষণগুলো এর মাত্রার উপর নির্ভর করে। এর প্রধান লক্ষণগুলো হল হঠাৎ করে ঘামতে শুরু করা, কাঁপুনি হওয়া, বুক ধড়ফড় করা, মেজাজ খিটখিটে হয়ে যাওয়া, মাথা ব্যথা করা, চোখে ঝাপসা দেখা, তীব্র ঝিমুনির ভাব হওয়া, অসংলগ্ন কথা বলা বা আচরণ করা এবং কখনো কখনো জ্ঞান হারিয়ে ফেলা। দিনের যেকোন সময় এই লক্ষণগুলো দেখা দিতে পারে। লক্ষণগুলো দেখা দেয়ার সাথে সাথে চিকিৎসা নিতে হবে। অজ্ঞান না হয়ে গেলে রোগী নিজেই নিজের চিকিৎসা করতে পারে। অন্যথায় রোগীর কাছে যারা থাকবেন তাদেরই চিকিৎসা শুরু করে দিতে হবে। এক্ষেত্রে গ্লুকোজ বা চিনির শরবত, কোমল পানীয়, ফলের জুস- হাতের কাছে যা পাওয়া যায় তাই রোগীকে খাওয়াতে হবে। রোগী অজ্ঞান হয়ে গেলে চামচে করে অল্প অল্প চিনির বা গ্লুকোজের শরবত খাওয়াতে হবে বা শিরাপথে গ্লুকোজ স্যালাইন দিতে হবে। মনে রাখতে হবে যে এক্ষেত্রে প্রতিটা মিনিটই মহামূল্যবান। চিকিৎসা শুরু করতে দেরি হলে রোগী মারা যেতে পারে। এর মাঝে রোগীর জ্ঞান না ফিরলে অতি দ্রুত হাসপাতালে নিতে হবে।

খ) ডায়াবেটিক কিটোএসিডোসিস ঃ

ডায়াবেটিক কিটোএসিডোসিস একটি প্রাণঘাতী রোগ যা ডায়াবেটিস রোগীদের শরীরে ইনসুলিনের মাত্রা একেবারে কমে গেলে দেখা দেয়। এসময় মানবদেহ শর্করা ব্যবহার করতে পারেনা। তাই শরীরে শক্তি সরবরাহ বজায় রাখার জন্য চর্বি হতে কিটোন তৈরি হয়। কিন্তু অত্যধিক মাত্রায় কিটোন তৈরি হলে কিটোএসিডোসিস অবস্থার সৃষ্টি হয়। সাধারণত টাইপ-১ ডায়াবেটিসের রোগীরা এই রোগে বেশি আক্রান্ত হয়। অনেক রোগী এই রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে আসার পর জানা যায় যে তারা আগে থেকেই ডায়াবেটিসে ভুগছে। সাধারণত ডায়াবেটিস রোগী বিভিন্ন ধরণের সংক্রামক রোগ (মূত্রনালীর সংক্রমণ, শ্বসননালীর সংক্রমণ, পরিপাকনালীর সংক্রমণ), স্ট্রোক, আকস্মিক হৃদরোগ, সার্জারি, শারীরিক দূর্ঘটনা, গর্ভাবস্থা ইত্যাদি কারণে ডায়াবেটিক কিটোএসিডোসিস রোগে আক্রান্ত হয়।

কিটোএসিডোসিসে আক্রান্ত রোগীর লক্ষণসমূহ হচ্ছে বমি বমি ভাব ও বমি হওয়া, শারীরিক দুর্বলতা, পেট ব্যথা, অতিরিক্ত প্রস্রাব হওয়া, শ্বাসকষ্ট, অতিরিক্ত পিপাসা, মুখ ও চামড়া শুকিয়ে যাওয়া, রক্তচাপ কমে যাওয়া, ঘুম ঘুম ভাব হওয়া, চেতনা বিলোপ হওয়া ইত্যাদি। কোন ডায়াবেটিস রোগীর ক্ষেত্রে এই সমস্যাগুলো দেখা দেয়া মাত্রই তাকে হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। চিকিৎসার মূল উপাদান ইনসুলিন ও শিরাপথে নরমাল স্যালাইন প্রয়োগ করা। এর সাথে অন্য কোন রোগ থাকলে তার চিকিৎসাও শুরু করতে হবে। দ্রুত চিকিৎসায় এই রোগ সহজেই নিয়ন্ত্রণে আসে (মৃত্যুর হার ২-৫%)।

গ) হাইপার-অসমোলার নন-কিটোটিক কোমা ঃ

রক্তে শর্করার মাত্রা অত্যধিক পরিমাণে বেড়ে গেলে এই রোগ হয়। টাইপ-২ ডায়াবেটিস রোগীদের এই রোগ বেশি হয়। কিটোএসিডোসিসের মত এই রোগে কিটোন তৈরি হয়না। সাধারণত যেসব কারণে কিটোএসিডোসিস হয় সেসব কারণেই হাইপার-অসমোলার নন-কিটোটিক কোমাও হতে পারে।

এই রোগের লক্ষণগুলো অনেকটাই কিটোএসিডোসিসের মত। তবে এই রোগে প্রস্রাবের পরিমাণ ও পানিশূন্যতা দুটোই বেশি হয় এবং রোগী দ্রুত জ্ঞান হারিয়ে অচেতন হয়ে যেতে পারে। এই রোগে আক্রান্ত রোগীকেও যত দ্রুত সম্ভব হাসপাতালে নিতে হবে। কিটোএসিডোসিস মত এই রোগের চিকিৎসার মূল উপাদান ইনসুলিন ও শিরাপথে নরমাল স্যালাইন প্রয়োগ করা। এরসাথে অন্য কোন রোগ থাকলে তার চিকিৎসাও শুরু করতে হবে। দ্রুত চিকিৎসা দেয়া হলেও এই রোগে মৃত্যুর হার প্রায় ১৫-২০%।

ঘ) ল্যাকটিক এসিডোসিস ঃ

ডায়াবেটিস রোগীর কোষগুলো যখন পূর্ণভাবে গ্লুকোজ ব্যবহার করতে পারে না, তখন শরীরে ল্যাকটিক এসিডের পরিমাণ বাড়তে থাকে এবং রক্তের অম্লত্ব বেড়ে যায়। তখন এই অবস্থাকে ল্যাকটিক এসিডোসিস বলা হয়।

চিত্রঃ ডায়াবেটিক ফুট আলসার

তাছাড়া যেসব রোগী মেটফরমিন ঔষধ সেবন করেন তাদের কিডনী রোগ থাকলে ল্যাকটিক এসিডোসিস হতে পারে। বমি বমি ভাব ও বমি হওয়া, পেট ব্যথা, শ্বাসকষ্ট, বুক ধড়ফড় করা, দুর্বলতা, রক্তচাপ কমে যাওয়া ইত্যাদি ল্যাকটিক এসিডোসিসের লক্ষণ। এসব রোগ-লক্ষণ কোন ডায়াবেটিস রোগীর শরীরে দেখা দিলে তাকে দ্রুত হাসপাতালে নিতে হবে। বেশিরভাগ সময়ই রোগীর জন্য নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। মৃত্যুর হার প্রায় ৪৫- ৫০%।

দীর্ঘমেয়াদী জটিলতা

ডায়াবেটিস রোগীদের রক্তে শর্করার পরিমাণ যদি দীর্ঘদিন ধরে অনিয়ন্ত্রিত থাকে তাহলে বিভিন্ন ধরণের জটিলতা তৈরি হয়। ডায়াবেটিসের পাশাপাশি কোন রোগী যদি ধূমপান করেন বা তার উচ্চ রক্তচাপ বা রক্তে চর্বির আধিক্য থাকে তাহলে জটিলতা অনেক দ্রুত দেখা দিতে পারে। এসব জটিলতার কারণেই বেশিরভাগ ডায়াবেটিস রোগী মারা যায়। ডায়াবেটিসের দীর্ঘমেয়াদী জটিলতাগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়।

চিত্রঃ ডায়াবেটিক রোগীর উপযুক্ত খাদ্য

ক) মাইক্রোভাসকুলার জটিলতাঃ দীর্ঘমেয়াদী অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিসের ফলে ছোট ছোট রক্তনালীতে চর্বি জমে তা বন্ধ হয়ে যায়। ফলে শরীরে বিভিন্ন জটিলতা দেখা দেয়। যেমন ঃ

- ***ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি*** ঃ এই রোগে চোখের রেটিনা ধীরে ধীরে নষ্ট হতে থাকে এবং রোগীর দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পায়। এই অবস্থা চলতে থাকলে রেটিনা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে রোগী পুরোপুরি অন্ধ হয়ে যায়। উন্নত বিশ্বে অন্ধত্বের অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি। রেটিনার পাশাপাশি চোখের অন্যান্য অংশও ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। ডায়াবেটিস রোগীদের চোখে ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রমণ দেখা যায়। তাছাড়া ডায়াবেটিসের জন্য চোখে ছানি পড়া ও গ্লুকোমা ত্বরান্বিত হতে পারে।
- ***ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথি*** ঃ এই রোগে ধীরে ধীরে কিডনী নষ্ট হয়ে যায়। বর্তমানে কিডনী নস্ট হয়ে যাওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস। ডায়াবেটিস রোগীদের রক্তে ক্রিয়েটিনিন ও ইউরিয়ার মাত্রা পরীক্ষা করে কিডনীর অবস্থা জানা যায়। কিডনী বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হলে মূত্রের নমুনায় প্রোটিন পাওয়া যেতে পারে।
- ***ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথি*** ঃ এই রোগে ধীরে ধীরে রোগীর স্নায়ুতন্ত্র অকেজো হয়ে যায়। ফলে রোগীর হাত-পায়ে অনুভূতি হ্রাস পায় ও হাত-পা জ্বালা-পোড়া করে। তাছাড়া রোগের তীব্রতা বেশি হলে রোগী জননেন্দ্রিয়ের দুর্বলতায় (Erectile dysfunction) ভুগে। তাছাড়া রোগী ডায়রিয়া বা কোষ্ঠকাঠিন্য, হাত ও পায়ের মাংশপেশীর দুর্বলতা, ঠিকমত প্রস্রাব না হওয়া ইত্যাদি সমস্যায় ভুগতে পারে।
- ***ডায়াবেটিক ফুট*** ঃ পায়ের ছোট ছোট রক্তনালী বন্ধ হয়ে পা ধীরে ধীরে শুকিয়ে যায় এবং পায়ে পচন ধরে। যেহেতু ডায়াবেটিস রোগীর পায়ে অনুভূতি কম থাকে, তাই পায়ে আঘাত লাগলে অনেক সময় তা বোঝা যায় না। পরে সেখানে ঘা হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া, রক্তনালী সরু হয়ে যাওয়ায় রক্ত চলাচল ব্যাহত হয়। ফলে ঘা সহজে শুকাতে চায়না। খালি পায়ে না হাঁটা এবং হেঁটে এসে ভালভাবে পা পরীক্ষা করলে অনেক ক্ষেত্রেই পায়ের সংক্রমণ প্রতিরোধ করা যায়।

খ) ম্যাক্রোভাসকুলার জটিলতাঃ দীর্ঘমেয়াদী অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিসের ফলে শরীরের অপেক্ষাকৃত বৃহৎ রক্তনালীতে চর্বি জমে তা আংশিক বা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। ফলে শরীরে বিভিন্ন জটিলতা দেখা দেয়। যেমন ঃ

- ***করোনারী আর্টারি ডিজিজ*** ঃ এই রোগে হৃদ্‌পিন্ডের রক্তনালী বন্ধ হয়ে যায়। রোগী বুকে ব্যথা অনুভব করে। এমনকি রক্তনালী পুরোপুরি বন্ধ হয়ে হৃদ্‌পিন্ড থেমে যায় এবং রোগী মারা যায়।
- ***সেরিব্রোভাসকুলার ডিজিজ*** ঃ এই রোগে মস্তিষ্কের রক্তনালী বন্ধ হয়ে রোগী স্ট্রোকে আক্রান্ত হতে পারে।
- ***পেরিফেরাল ভাসকুলার ডিজিজ*** ঃ এই রোগে পায়ের রক্তনালী বন্ধ হয়ে যায়। ফলে পায়ে তীব্র ব্যথা হয় এবং পায়ে পচন ধরতে পারে।

ডায়াবেটিসজনিত জটিলতা প্রতিরোধের উপায়

- সময়মত ডায়াবেটিসের ওষুধ খাওয়া বা ইনসুলিন নেয়া, ওষুধ বা ইনসুলিন গ্রহণের ২০-৩০ মিনিটের মধ্যে খাবার গ্রহণ করা, বেশিক্ষণ না খেয়ে থাকা, একবারে বেশি না খেয়ে অল্প করে বার বার খাওয়া, খালি পেটে ব্যায়াম বা হাঁটা-চলা থেকে বিরত থাকা, হাঁটতে যাওয়ার সময় সাথে সুগার ট্যাবলেট বা চিনি রাখা, হাইপোগ্লাইসেমিয়ার লক্ষণ দেখা দেয়ার সাথে সাথে ব্যবস্থা নেয়া- সাধারণ এই নিয়মগুলো মেনে চললে হাইপোগ্লাইসেমিয়া ও হাইপোগ্লাইসেমিয়াজনিত মৃত্যু প্রতিরোধ করা যায়।
- ডায়াবেটিস রোগীর জন্য নির্দেশিত জীবন-যাপন পদ্ধতি (খাওয়া-দাওয়া, ব্যায়াম, হাঁটা-চলা, ঘুম) অনুসরণ করা, সময়মত ডায়াবেটিসের ওষুধ খাওয়া বা ইনসুলিন নেয়া, কোন শারীরিক জটিলতা দেখা দিলে দ্রুত তার চিকিৎসা করা- এই নিয়মগুলো মেনে চললে ডায়াবেটিক কিটোএসিডোসিস বা হাইপার-অসমোলার নন-কিটোটিক কোমা প্রতিরোধ করা যায়।
- স্বাস্থ্যসম্মত জীবন-যাপন পদ্ধতি মেনে চলা, সময়মত ও সঠিক মাত্রায় ঔষধ বা ইনসুলিন গ্রহণ করা, নিয়মিত বিরতিতে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা চোখ ও হৃদ্‌পিন্ড পরীক্ষা করা - ইত্যাদি নিয়ম মেনে চললে ডায়াবেটিসের দীর্ঘমেয়াদী জটিলতা প্রতিরোধ করা যায়।
- সর্বোপরি, ডায়াবেটিস ও এর চিকিৎসা সম্পর্কে সম্যক ধারণার পাশাপাশি ডায়াবেটিসের জটিলতা প্রতিরোধের জন্য প্রবল মানসিক শক্তির সাহয্যেই ডায়াবেটিসজনিত মৃত্যু প্রতিরোধ করা সম্ভব।

তথ্যসূত্র

❑ স্কয়ার

আমাদের দেশে স্ট্রোক এখন বেশ পরিচিত এবং গুরুতর একটি রোগ। বাংলাদেশে মৃত্যুর তৃতীয় প্রধান কারণ হল স্ট্রোক। আর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে স্ট্রোকের ফলে মারা যাবার দিক থেকে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান ৮৪ তম। কোন কারণে মস্তিষ্কে রক্তপ্রবাহ বাধাগ্রস্থ হলে (সেটা রক্তনালীতে রক্ত জমাট বেঁধেই হোক বা রক্তনালী ছিঁড়ে রক্তক্ষরণের জন্যই হোক) তাকে স্ট্রোক বলা হয়।

স্ট্রোকের ঝুঁকিসমূহ

স্ট্রোকের ঝুঁকি কিছু নির্দিষ্ট বিষয় দিয়ে প্রভাবিত হয়। এদেরকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন:

১. নিয়ন্ত্রণ করা যায় না এমন বিষয়সমূহ:	২. নিয়ন্ত্রণযোগ্য বিষয়সমূহ:
ক) বয়স: বয়স্কদের ঝুঁকি বেশি	ক) উচ্চ রক্তচাপ
খ) লিঙ্গ: মহিলাদের চেয়ে পুরুষেরা বেশি আক্রান্ত হয়	খ) ডায়াবেটিস
গ) জাতি: এশিয়ানদের থেকে ইউরোপিয়ানদের ঝুঁকি বেশি	গ) হৃদপিন্ডের অসুখসমূহ
ঘ) রক্ত-সম্পর্কীয় আত্মীয়দের স্ট্রোক থাকলে	ঘ) রক্তে চর্বির উচ্চমাত্রা
ঙ) হৃদপিন্ডের অসুখ বা আগে একবার স্ট্রোক হয়ে থাকলে	ঙ) ধূমপান এবং তামাক সেবন
	চ) অতিরিক্ত মদ্যপান
	ছ) স্থূলতা
	জ) শারীরিক পরিশ্রমের অভাব

স্ট্রোকের ধরণসমূহ

যে সকল ক্ষেত্রে স্ট্রোকের উপসর্গ শুরু হবার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই তা আবার সেরে যায় সেগুলোকে ট্রানজিয়েন্ট ইশকেমিক অ্যাটাক (Transient Ischemic Attack বা TIA) বলে যা মিনি স্ট্রোক নামেও পরিচিত। সচরাচর এই উপসর্গগুলো কয়েক মিনিট থেকে কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত স্থায়ী হয়। তাড়াতাড়ি সেরে যায় বলে রোগী বা রোগীর আত্মীয়স্বজন এই ঘটনাকে তেমন গুরুত্ব দেয় না। অথচ এই ধরণের রোগীদের প্রতি ৫ জনের মধ্যে ১ জন পরবর্তী তিন মাসের মধ্যে বড় ধরণের স্ট্রোক দ্বারা আক্রান্ত হবার ঝুঁকিতে থাকে এবং পরবর্তী কয়েকটা দিন ঝুঁকির মাত্রা সবচেয়ে বেশি।

তবে উপসর্গ ২৪ ঘণ্টার বেশি স্থায়ী হলে সেটা স্ট্রোক ধরা হয় যা সাধারণত দুই ধরণের।

ইশ্‌কেমিক স্ট্রোক (Ischemic stroke): রক্তনালীর ভেতর রক্ত জমাট বেঁধে রক্তপ্রবাহে বাধা তৈরি হলে তাকে ইশ্‌কেমিক বা রক্তস্বল্পতা জনিত স্ট্রোক বলে। এর ফলে মস্তিষ্কের সংশ্লিষ্ট অংশগুলোতে রক্ত ও অক্সিজেন সরবরাহ ব্যাহত হয় এবং ঐ অংশগুলোর কোষ নষ্ট হতে থাকে।

হেমোরেজিক স্ট্রোক (Hemorrhagic stroke): কোন কারণে যদি মস্তিষ্কে রক্ত সরবরাহকারী নালী ছিঁড়ে রক্তক্ষরণ শুরু হয় এবং তার ফলে ঐ অংশের রক্ত ও অক্সিজেন সরবরাহে ব্যাঘাত ঘটে তাহলে তাকে হেমোরেজিক বা রক্তক্ষরণ জনিত স্ট্রোক বলে। নানাবিধ সমস্যার কারণে এই ধরণের স্ট্রোক হতে পারে তবে এ ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে অনিয়ন্ত্রিত উচ্চ রক্তচাপ (বিশেষ করে অনিয়মিত ওষুধ সেবনকারীদের জন্য) উল্লেখযোগ্য।

স্ট্রোকের উপসর্গ

স্ট্রোকের লক্ষণ-উপসর্গ আসলে নির্ভর করে মস্তিষ্কের কোন অংশ কতটুকু আক্রান্ত হয়েছে তার উপর। সাধারণত যে সমস্ত লক্ষণ-উপসর্গ দেখে স্ট্রোক শনাক্ত করা যেতে পারে তা হল:

- শরীরের এক পাশে বা উভয় পাশে মুখ, হাত বা পায়ের দুর্বলতা, অবশ লাগা বা পক্ষাঘাত (প্যারালাইজড)
- কথা বলতে বা বুঝতে অসুবিধা হওয়া
- ঝিমুনি ভাব, ভারসাম্যহীনতা বা কারণ ছাড়াই পড়ে যাওয়া
- এক চোখে বা দুই চোখেই হঠাৎ করে ঝাপসা দেখা, কম দেখা বা একেবারে না দেখা
- মাথাব্যথা (সাধারণত তীব্র এবং হঠাৎ করে শুরু হয়)
- ঢোক গিলতে অসুবিধা হওয়া

স্ট্রোক হলে উপরের লক্ষণগুলোর এক বা একাধিক থাকতে পারে এবং তা কয়েক সেকেন্ড থেকে শুরু করে ২৪ ঘণ্টার বেশি সময় ধরে স্থায়ী হতে পারে। স্ট্রোক একটি জরুরী অবস্থা। কেউ স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়েছে সন্দেহ হলে সময় নষ্ট না করে যত দ্রুত সম্ভব হাসপাতালে নিতে হবে এবং চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

রোগ নির্ণয় ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা

সাধারণত কিছু পরীক্ষা করা হয় যা সবার জন্য প্রযোজ্য। আর কিছু পরীক্ষা রোগী অনুযায়ী আলাদা হতে পারে। পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলোকে দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

প্রথমত, স্ট্রোক নিশ্চিতকরণের জন্য সব রোগীর ক্ষেত্রে ২৪ ঘণ্টার ভেতরে মস্তিষ্কের সিটি স্ক্যান করতে হবে। এর ফলে মস্তিষ্কের কোথায় এবং কী ধরণের (ইশকেমিক না হেমোরেজিক) স্ট্রোক হয়েছে তা বোঝা যায়। পরবর্তীতে প্রয়োজন হলে এমআরআই করা যেতে পারে।

দ্বিতীয়ত, একইসাথে স্ট্রোকের ঝুঁকি বা কারণগুলো বের করার জন্য এবং রোগীর শারীরিক অবস্থার সার্বিক পরিস্থিতি জানার জন্য বেশ কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল:

- ই সি জি (Electrocardiogram বা ECG)
- রক্ত পরীক্ষা (Complete Blood Count)
- রক্তে শর্করার পরিমাণ (Random Blood Sugar)
- রক্তে ইলেক্ট্রোলাইটের পরিমাণ (Serum Electrolyte)
- রক্তে ক্রিয়েটিনিনের পরিমাণ (Serum Creatinine)
- রক্তে চর্বির পরিমাণ (Fasting lipid profile)
- প্রস্রাব পরীক্ষা (Urine Routine Test)
- বুকের এক্স-রে (Chest X-ray)

চিকিৎসা

স্ট্রোকের চিকিৎসার উদ্দেশ্য হল মস্তিষ্কের ক্ষতিগ্রস্ত অংশের পরিমাণ কমানো, পরবর্তী জটিলতাগুলো প্রতিরোধ করা, পুনর্বাসনের মাধ্যমে রোগীর অক্ষমতা বা প্রতিবন্ধকতা কমানো এবং পরবর্তী স্ট্রোকের ঝুঁকি কমানো। এজন্য সময় নষ্ট না করে বিশেষ করে অজ্ঞান রোগীর ক্ষেত্রে নিচের বিষয়গুলো দ্রুত পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

ক) তাৎক্ষণিক চিকিৎসা ঃ

১. রোগীর শ্বাসনালী, নাকের ছিদ্র, মুখ গহ্বর ইত্যাদি পরীক্ষা করতে হবে ঢোক গিলতে সমস্যা হলে মুখে কোন খাবার বা পানি দেয়া যাবে না।

২. রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাস পরীক্ষা করতে হবে। সুযোগ থাকলে রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণ দেখা উচিত। যদি অক্সিজেনের পরিমাণ ৯৫% এর কম হয় তবে কৃত্রিমভাবে অক্সিজেন দেবার ব্যবস্থা করতে হবে।

৩. রোগীর পালস এবং রক্তচাপ পরীক্ষা করতে হবে। প্রয়োজনে ওষুধ দিতে হবে। পানিশূন্যতার লক্ষণ থাকলে মুখে বা শিরায় স্যালাইন দিতে হবে। নরমাল স্যালাইন ছাড়া সাধারণত অন্য কোন স্যালাইন ব্যবহার করা উচিত নয়।

৪. রোগীকে বালিশ ছাড়া কাত করে শোয়াতে হবে এবং মাথা নিচু করে রাখতে হবে। এর ফলে মুখের ভেতর যেসব লালাজাতীয় পদার্থ জমবে তা বের হয়ে যাবে। দরকার হলে রোগীকে কোমরের কাছে বাঁকা করে হাঁটু ভাঁজ করে শোয়াতে হবে। রোগীকে একভাবে শুইয়ে না রেখে ২ ঘণ্টা পর পর পাশ বদলিয়ে দিতে হবে। তা না হলে হাতের কনুই, পায়ের গোড়ালি, পিঠের হাড়, নিতম্ব ইত্যাদিতে ঘা (pressure sore) হতে পারে।

৫. রোগীর পুষ্টির অবস্থা দেখতে হবে। মুখে খেতে না পারলে প্রয়োজনে নাকে নল দিয়ে খাবার দিতে হবে। সাধারণত ইশ্কেমিক স্ট্রোকের রোগীকে চাহিদা অনুযায়ী ২৪ ঘণ্টায় প্রায় ২০০০-২৫০০ মিলি এবং হেমোরেজিক স্ট্রোকের বেলায় চাহিদার চেয়ে ৫০০-১০০০ মিলি খাবার কম খাবার দিতে হয়। রোগীর জ্বর থাকলে বা খুব গরম আবহাওয়ায় খাবারের পরিমাণ একটু বাড়ানো যেতে পারে। নাকের নল দিয়ে বিভিন্ন রকমের খাবার একসাথে মিশিয়ে মন্ড (paste) বানিয়ে তারপর খাওয়াতে হবে। একই ধরণের খাবার বার বার দেয়া ঠিক নয়। স্ট্রোকের রোগীদের ২৪ ঘণ্টায় ১-২ চা চামচ (৫-১০ গ্রাম) লবণ খেতে দেয়া উচিত কারণ এরা প্রায়ই সোডিয়ামের অভাবে ভুগে। ডায়াবেটিস থাকলে হরলিক্স, টিনের মিষ্টি জাতীয় খাবার এসব দেয়া যাবে না। তবে সারাদিনে এক বার ফলের রস দেয়া যায়। মনে রাখা উচিত যে একবারে ১০০-২০০ মিলির বেশি খাবার দেয়া যাবে না, পর পর দুই খাবারের মাঝে ২-৪ ঘণ্টা বিরতি দিতে হবে এবং রাত ১০ টা থেকে সকাল ৬ টা পর্যন্ত খাবার দেয়া বন্ধ রাখতে হবে।

৬. প্রথম এক সপ্তাহ উচ্চ রক্তচাপ কমানোর দরকার হয় না। কমালে মস্তিষ্কের ক্ষতিগ্রস্ত অংশের পরিমাণ আরও বাড়তে পারে। সাধারণত কয়েকদিনের মধ্যে আপনাআপনিই রক্তচাপ স্বাভাবিক মাত্রায় চলে আসে। শুধুমাত্র যদি সিস্টোলিক রক্তচাপ ২২০ এর বেশি এবং ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ ১২০ এর বেশি থাকে তবে ওষুধের দরকার হয়। সেক্ষেত্রেও ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ ১০০ এর নিচে নামানো যাবে না। তবে কারও হার্ট ফেইলুর, কিডনি ফেইলুর, উচ্চ রক্তচাপ জনিত খিঁচুনি-এধরণের কোন অসুখ থাকলে তার ক্ষেত্রে রক্তচাপ কমানো দরকার। তাছাড়া সিটি স্ক্যানের মাধ্যমে হেমোরেজিক স্ট্রোক নিশ্চিত হওয়া গেলে সেক্ষেত্রেও রক্তচাপ কমাতে হতে পারে।

৭. রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ দেখতে হবে। এর মান ১১.১ মিলি মোল/লিটার বা ২০০ মিগ্রা / ডেসিলিটার এর বেশি হলে ইনসুলিন দিতে হবে।

৮. রোগী ঠিকমত প্রস্রাব করতে পারছে কিনা তা দেখতে হবে। রোগীর প্রস্রাব বন্ধ থাকলে বা আপনা আপনি প্রসাব হয়ে গেলে প্রস্রাবের নল (catheter) লাগাতে হবে।

৯. চোখের এবং মুখ গহ্বরের যত্ন নিতে হবে।

- চোখ খোলা থাকলে বন্ধ করে রাখতে হবে
- প্রয়োজনে চোখে অ্যান্টিবায়োটিক ড্রপ বা মলম লাগাতে হবে
- মুখগহ্বরের জন্য মাউথওয়াশ বা নিস্টাটিন জাতীয় ঔষধ ব্যবহার করা যেতে পারে

স্ট্রোক সম্পর্কিত কিছু প্রচলিত ভুল ধারণা

ভুল ধারণাঃ স্ট্রোক প্রতিরোধ করা যায় না।

সঠিক তথ্যঃ স্ট্রোক প্রতিরোধ করা সম্ভব।

ভুল ধারণাঃ স্ট্রোকের চিকিৎসা করা যায় না।

সঠিক তথ্যঃ স্ট্রোকের চিকিৎসা করা যায় এবং জরুরী ভিত্তিতে করতে হয়।

ভুল ধারণাঃ স্ট্রোক শুধু বয়স্কদের হয়।

সঠিক তথ্যঃ স্ট্রোক যে কোন বয়সে হতে পারে।

ভুল ধারণাঃ স্ট্রোক হৃদ্‌পিন্ডের অসুখ।

সঠিক তথ্যঃ স্ট্রোকে মস্তিষ্ক আক্রান্ত হয়।

ভুল ধারণাঃ স্ট্রোক পরবর্তী অল্প কয়েক মাসই শুধু রোগী আরোগ্য লাভ করে।

সঠিক তথ্যঃ স্ট্রোকের পর সারা জীবনই রোগী আরোগ্য লাভের প্রক্রিয়ার ভেতর থাকে।

খ) নির্দিষ্ট ওষুধের ব্যবহার ঃ

১. অ্যাসপিরিন: ইশ্কেমিক স্ট্রোকে আক্রান্ত হলে সাথে সাথে ট্যাবলেট অ্যাসপিরিন ৩০০ মিগ্রা খাওয়াতে হবে। এটি পরে দিনে ৭৫-১৫০ মিগ্রা করে চালু রাখতে হবে (সাথে এনজাইনা বা বুকে ব্যথা না থাকলে ক্লপিডগরেল দেওয়ার দরকার নেই)।

২. থ্রম্বোলাইসিস: লক্ষণ শুরুর ৩ ঘণ্টার মধ্যে রোগী হাসপাতালে পৌঁছাতে পারলে রিকম্বিনেন্ট টিস্যু প্লাজমিনোজেন অ্যাক্টিভেটর (rt-PA) ব্যবহার করা হয়। তবে এটা শুধু উচ্চ সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন হাসপাতালে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা করা সম্ভব।

৩. রক্ত জমাট বিরোধী ওষুধ: কিছু কিছু ক্ষেত্রে হেপারিন এবং ওয়ারফেরিন ব্যবহার করা হয়।

৪. স্ট্যাটিন: রক্তের চর্বির মাত্রা বেশি হলে স্ট্যাটিন জাতীয় ওষুধ (যেমন অ্যাটোর্ভাস্ট্যাটিন, পিটাভাস্ট্যাটিন, রসুভাস্ট্যাটিন) দিতে হয় যা পরবর্তীতে চালু রাখা উচিত।

গ) শল্যচিকিৎসা:

কোন কোন ক্ষেত্রে দেরি না করে রুগীর জীবন বাঁচানোর জন্য জরুরী ভিত্তিতে মস্তিষ্কের অপারেশন করার প্রয়োজন হতে পারে।

স্ট্রোক পরবর্তী জটিলতা

অনেকগুলো বিষয় আছে যা স্ট্রোক পরবর্তী শারীরিক সমস্যা এবং রোগীর ভাল হয়ে ওঠাকে প্রভাবিত করে। যেমন স্ট্রোকের ধরণ, জমাট বাঁধা বা ছিঁড়ে যাওয়া ধমনীর অবস্থান, মস্তিষ্কের নষ্ট হওয়া অংশের অবস্থান ও পরিমাণ, স্ট্রোকের আগে রোগীর শারীরিক অবস্থা ইত্যাদি। প্রত্যেকটা স্ট্রোকই স্বতন্ত্র যার ফলে একেক জন রোগীর সমস্যা এবং চাহিদা একেক রকম হয়। সাধারণত মস্তিষ্কের যে দিকটা ক্ষতিগ্রস্থ হয় শরীরের অন্য দিকটা আক্রান্ত হয়। যে ধরণের সমস্যা পরবর্তীতে হতে পারে তা হল :

- শরীরের একপাশে বা উভয় পাশে হাত-পায়ে দুর্বলতা অনুভব করা (এর ফলে দাঁড়াতে, হাঁটতে বা ভারসাম্য রক্ষায় অসুবিধা হতে পারে)
- বিভিন্ন নড়াচড়ার মধ্যে সমন্বয়হীনতা (এতে করে বসলে বা দাঁড়ালে রোগী এক দিকে কাত হয়ে বা পুরোপুরি পড়ে যেতে পারে)
- দেখা, শোনা, স্পর্শ, গন্ধ, স্বাদ ইত্যাদি অনুভূতির উপলব্ধি কমে যাওয়া
- ভাষাগত সমস্যা যেমন কথা বলতে, লিখতে, পড়তে বা অন্যদের কথা বুঝতে অসুবিধা হওয়া ইত্যাদি
- শব্দ উচ্চারণে সমস্যা হওয়া (ঠোঁট ও জিহ্বার সমন্বয়ের অভাবে এটা হয়)
- খাবার বা পানি গিলতে অসুবিধা হওয়া
- মনোযোগের অভাব হওয়া, স্মরণশক্তি লোপ পাওয়া
- কোন কাজ পরিকল্পনা মত করতে বা গুছিয়ে করতে অসুবিধা হওয়া
- সাধারণ দৈনন্দিন কাজকর্ম করতে না পারা
- স্ট্রোকের পর কেউ কেউ সব জিনিস দুইটা করে দেখেন (অনেকে এক পাশে কম দেখে বা একটা বস্তু কতটা দূরে আছে সেটা ঠিক মত বুঝতে পারে না)
- প্রস্রাব-পায়খানা স্বাভাবিকভাবে করতে না পারা
- কোষ্ঠকাঠিন্য হওয়া
- শ্বসনতন্ত্রের সংক্রমণ হওয়া (বিশেষ করে ভুলভাবে খাওয়ানোর ফলে ফুসফুসে খাবার বা পানি ঢুকে নিউমোনিয়া হয়। এটি রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটাতে পারে)
- প্রস্রাবের সংক্রমণ হওয়া
- দেহে সোডিয়ামের অভাব দেখা দেয়া
- দেহের যে অংশগুলোতে চাপ পড়ে সেখানে ঘা হওয়া
- রোগীর বিভিন্ন মানসিক রোগ দেখা দেয়া

চিকিৎসা পরবর্তী পুনর্বাসন

পুনর্বাসনের লক্ষ্য হচ্ছে রোগীর কাজ করার ক্ষমতার উন্নতি করা যাতে সে যতদূর সম্ভব স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করতে পারে। এটা অর্জনের ক্ষেত্রে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যেন রোগীর আত্মসম্মানবোধে কোন আঘাত না লাগে এবং স্ট্রোকের ফলে যে মৌলিক কাজগুলো তাকে নতুন করে শিখতে হবে (যেমন খাওয়া, কাপড় পরা, হাঁটা, কথা বলা ইত্যাদি) তাতেও যেন সে অনীহা বোধ না করে।

ফিজিওথেরাপি ঃ ইশ্কেমিক স্ট্রোকের ক্ষেত্রে যত দ্রুত সম্ভব ব্যায়াম ও অন্যান্য অনুশীলন শুরু করা উচিত। হেমোরেজিক স্ট্রোকের বেলায় রোগী একটু সুস্থ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা যায়। নিয়মিত অনুশীলনে হাত পা শক্ত হয়ে যাওয়া, কুঁচকে যাওয়া- এসব থেকে মুক্ত থাকা যায় এবং বিভিন্ন ধরণের হাঁটার সামগ্রীর (ছড়ি বা ক্রাচ) ব্যবহার শেখা যায়।

স্পিচ থেরাপি ঃ যাদের কথা বলতে সমস্যা হয় তাদের জন্য স্পিচ থেরাপিস্টের তত্ত্বাবধানে অনুশীলন বেশ ফলপ্রসূ হয়।

স্ট্রোক প্রতিরোধের উপায়

কিছু কিছু বিষয়ে সতর্ক হলে স্ট্রোকের ঝুঁকি অনেকটা কমানো যায়। যেমন-

- ধূমপান পরিহার করা
- অ্যালকোহল পরিহার করা
- নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম করা
- তেল-চর্বি যুক্ত খাবার বাদ দেয়া
- শরীরের ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা
- উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা
- হৃদ্‌পিন্ডের অসুখগুলো নিয়ন্ত্রণে রাখা
- ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখা
- রক্তে চর্বির মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা
- চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী নিয়মিত ওষুধ সেবন করা

গত কয়েক দশক ধরে আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের ধারায় ক্রমান্বয়ে যে পরিবর্তন এসেছে তার ফলে স্ট্রোকের মত অসুখের ব্যাপকতাও অনেক বেড়ে গেছে। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে স্ট্রোকের ফলে অসুস্থতা এবং মৃত্যুর দরুন প্রতিবছর বাংলাদেশে যে অর্থনৈতিক ক্ষতি হয় তার পরিমাণ প্রায় ৪০৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বা ২,১৮৪ কোটি টাকা। অথচ একটু সচেতনতার পাশাপাশি ঝুঁকিগুলো যেমন উচ্চ রক্তচাপ, ধূমপান, ডায়াবেটিস, স্থূলতা ইত্যাদি এড়িয়ে চললে স্ট্রোকের হাত থেকে মুক্ত থাকা তেমন একটা কঠিন নয়।

তথ্যসূত্র

❑ স্কয়ার

ভৌগোলিক ও আবহাওয়াগত কারণে বাংলাদেশসহ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশ যেমন ভারত, শ্রীলংকা, পাকিস্তান, নেপাল, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া সাপের উৎকৃষ্ট বাসস্থান। উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে প্রচুর পরিমাণে সাপ পাওয়া যায়। এন্টার্কটিকা মহাদেশ, কয়েকটি দ্বীপ দেশ (নিউজিল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, আইসল্যান্ড) এবং গভীর মহাসাগরে সাপ দেখা যায় না। প্রতিবছর সারা পৃথিবীতে প্রায় ৫ লাখ মানুষ সাপের কামড়ের শিকার হয় এবং প্রায় ৩০,০০০-৪০,০০০ মানুষ প্রাণ হারায়। তবে কোন কোন গবেষণা অনুযায়ী এই সংখ্যা অনেক বেশি। সাপের কামড়ে প্রাণহানির ঘটনার বেশিরভাগই ঘটে থাকে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। বাংলাদেশে গ্রামাঞ্চলে বিশেষ করে বর্ষাকালে সাপে কামড়ানোর ঘটনা খুবই সাধারণ। পুরোপুরি জানা না গেলেও অতীতের গবেষণা প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় ৬০০০ মানুষ সাপের কামড়ে প্রাণ হারায়। সুতরাং এটা নিঃসন্দেহ যে সাপে কাটা বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য-সমস্যা। চট্টগ্রাম ও বরিশাল অঞ্চলে সাপে কাটার ঘটনা বেশি ঘটে।

সাপের সাধারণ বৈশিষ্ট্য

সাপ শীতল রক্তবিশিষ্ট এক ধরণের মাংশাসী প্রাণী। প্রজাতিভেদে সাপের দৈর্ঘ্য ১০ সেন্টিমিটার হতে প্রায় ৯ মিটার হতে পারে। পৃথিবীতে প্রায় ৩৪০০ প্রজাতির সাপ পাওয়া যায় যার বেশিরভাগ বিষাক্ত নয়। তবে সব সাপই শিকারী। সাপের প্রধান খাদ্য হচ্ছে ব্যাঙ, পাখি, মাছ, ইঁদুর, টিকটিকি, অন্যান্য সাপ, ডিম, শামুক, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি। অজগর ও অন্যান্য বড় আকারের সাপ আরও বড় শিকার ধরতে পারে যেমন হরিণ, ছাগল, শেয়াল, কুকুর ইত্যাদি। সাপ ঘ্রাণেন্দ্রিয় (জিহ্বা) ব্যবহার করে শিকারের উপস্থিতি টের পায়। এদের দৃষ্টিশক্তি খুব তীক্ষ্ণ না হলেও অনেক সাপ বস্তুর নড়াচড়া বুঝতে পারে। অনেক সাপ আবার অবলোহিত রশ্মির সাহায্যে শিকার বা শিকারীর উপস্থিতি বুঝতে পারে। তাছাড়া সাপ ভূমিতে ও বাতাসে কম্পনের উৎস নির্ণয় করতে পারে।

সাপ বছরে কয়েকবার তাদের খোলস পাল্টায়। এভাবে তারা নতুন চামড়া পায় এবং বহিস্থঃ পরজীবী হতে মুক্ত হয়। যৌন পদ্ধতিতে সাপ বংশ-বিস্তার করে। স্ত্রী-সাপ একবারে অনেকগুলো ডিম দেয় যা হতে বাচ্চা জন্ম নেয়। যখন পরিবেশের তাপমাত্রা সাপের দেহের অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রার চেয়ে কমে যায়, তখন সাপ সাধারণত নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যায় এবং অলসভাবে সময় কাটায়। মাটির গর্ত, পাহাড়ের ফাঁক-ফোকর, গাছের গায়ের গর্ত, উল্টে যাওয়া গাছ, ঝোঁপ-ঝাড়, খড়ের গাদা, গোয়াল ঘর ও গোলা ঘরের আঁনাচে-কানাচে, ইট-পাথরের ও কাঠের স্তূপ ইত্যাদিতে সাপ আশ্রয় নেয়।

সাপে কাটার স্থান ও সময়

বেশিরভাগ সাপ মানুষের কাছ থেকে দূরে থাকে। অজগরজাতীয় বড় সাপ ছাড়া অন্যান্য সাপ নিজেরা আক্রান্ত না হলে সহজে মানুষকে কামড়ায় না। মানুষ কর্মক্ষেত্রেই সবচেয়ে বেশি সাপের কামড়ের শিকার হয়। কিছু কিছু কাজের সময় সাপে কাটার ঘটনা বেশি ঘটে যেমন কৃষি কাজ, মাছ ধরা, বনে গাছ কাটা, গাছ হতে ফল ও ফুল সংগ্রহ করা, গাছের নার্সারিতে কাজ করা ইত্যাদি। বর্ষাকালে চারদিক যখন পানিতে থই থই করে তখন সাপ আশ্রয়ের খোঁজে লোকালয়ে চলে আসে। এসময় সাপে কামড়ানোর ঘটনা বেশি ঘটে। গ্রামে অনেক বাড়ির আশে-পাশে ঝোঁপ-ঝাড় থাকে যা সাপের আশ্রয়স্থল। রাতের বেলা প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে ও অন্যান্য কাজে ঘরের বাইরে গিয়ে অনেকেই সাপের কামড়ের শিকার হয়। এখনো গ্রামে অনেক কাঁচা ঘর-বাড়ি থাকে। এসব ঘরে বিভিন্ন গর্তে সাপ আশ্রয় নিতে পারে। ধান রাখার গোলাঘর বা গোয়ালঘরেও মানুষকে কামড়ানোর কথা শোনা যায়। তাছাড়া সাপের খেলা দেখাতে গিয়ে ও সাপ ধরতে গিয়েও অনেকে সাপের কামড় খায়।

সাপের প্রকারভেদ

পৃথিবীতে অনেক প্রকার সাপ পাওয়া যায়। সচরাচর বিষের উপস্থিতি-অনুপস্থিতির উপর ভিত্তি করে সকল সাপকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়ে থাকে।

ক) নির্বিষ সাপ (Non-Venomous Snake) ঃ

পৃথিবীর বেশিরভাগ সাপই আসলে নির্বিষ। সারা পৃথিবী জুড়েই এদের বিচরণ। নির্বিষ সাপের দাঁত থাকলেও বিষদাঁত (Fangs) নেই। এরা শরীরে বিষ উৎপন্ন করতে পারেনা। এরা মানুষকে কামড়ালেও তা মানুষের জীবনের জন্য হুমকি নয়। বাংলাদেশে অনেক প্রজাতির নির্বিষ সাপ থাকলেও ঢোঁড়া সাপ (Water Keelback Snake), দুমুখো সাপ (Indian Sand Boa), পানি সাপ (Marsh Snake), দাঁড়াশ সাপ (Indian Rat Snake), লাউডগা সাপ (Vine Snake), অজগর (Python) ইত্যাদি সচরাচর দেখা যায়।

নির্বিষ সাপ বিভিন্নভাবে শিকার করে। ছোট শিকারকে এরা সহজেই খেয়ে ফেলে। তবে শিকার বড় হলে দাঁত দিয়ে কামড়ে ছিড়ে ফেলে বা শিকারের দেহকে পেঁচিয়ে চাপ প্রয়োগ করে মেরে ফেলে। অজগর ও অন্যান্য বড় সাপ (যেমন বোয়া ও অ্যানাকোন্ডা) অনেক সময় শিকারকে জ্যান্ত অবস্থায় আস্ত গিলে ফেলে। নির্বিষ সাপের মাথা সাধারণত ত্রিকোণাকার এবং চওড়ায় দেহ অপেক্ষা ছোট হয়। এরা ফণা তুলতে পারেনা। এদের কামড়ের চিহ্ন বিষধর সাপের কামড়ের তুলনায় আলাদা। খুব সাবধানে খেয়াল করলে দুই সারি কামড়ের দাগ দেখা যায়। কাটা স্থানে ব্যাকটেরিয়াঘটিত সংক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

চিত্র ঃ নির্বিষ সাপের কামড়ের দাগ

খ) বিষধর সাপ (Venomous Snake) ঃ

বিষধর সাপ সারা পৃথিবীতেই পাওয়া যায় তবে সংখ্যায় নির্বিষ সাপের তুলনায় অনেক কম।

প্রতি বছর সারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিষধর সাপের কামড়ে অনেক লোক প্রাণ হারায়। বাংলাদেশের প্রধান বিষধর সাপগুলো হচ্ছে ভারতীয় গোখরা (Indian Cobra), রাজসাপ বা শঙ্খচূড় (King Cobra) বিভিন্ন ধরণের কেউটে (Common Krait, Banded Krait, Black Krait, Blue Krait), চন্দ্রবোড়া (Russell's Viper), ইত্যাদি। এছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে অনেক প্রজাতির বিষধর সাপ পাওয়া যায় যেমন Black Mamba, Rattle Snake, Death Adder, Inland Taipan। প্রায় সকল সামুদ্রিক সাপ বিষধর।

চিত্র: বিষধর সাপের কামড়ের দাগ (বাম) ও বিষদাঁত (ডান)

গোখরাজাতীয় বিষধর সাপের মাথা দেহের তুলনায় অধিক প্রশস্থ। এরা ফণা তুলতে পারে এবং শরীরে ভর দিয়ে অনেক উঁচু হয়ে দাঁড়াতে পারে। অন্য বিষধর সাপ ফণা তুলতে পারেনা। তবে বিষধর সাপের এক জোড়া বিষদাঁত থাকে। তাই এদের কামড়ের চিহ্ন নির্বিষ সাপের চেয়ে আলাদা। সাধারণত পাশাপাশি দুইটিমাত্র স্পষ্ট দাগ দেখা যায়।

সাপের বিষের প্রকৃতি

সাপের বিষ মূলত সাপের লালাগ্রন্থির নিঃসরণ। সাপের বিষের প্রধান কাজ হচ্ছে সাপকে শিকার ধরায় সহায়তা করা। বিষ প্রয়োগ করে সাপ শিকারকে মেরে ফেলে বা অবশ করে ফেলে। এটি শিকারকে পরিপাক করার কাজেও অংশ নেয়। যদি নিজে আক্রান্ত হয় তবে আত্মরক্ষার কাজেও সাপ তার বিষ ব্যবহার করে। সাপের বিষ এক ধরণের জটিল মিশ্রণ যেখানে প্রায় ২০টি বিভিন্ন ধরণের প্রোটিন ও এনজাইম থাকে। এসব প্রোটিন ও এনজাইম শিকারের দেহে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া তৈরি করে যার জন্য শিকার মারাও যেতে হবে। সাপের ভিন্নতা অনুযায়ী বিষের তীব্রতার তারতম্য হয়। বিষধর সাপ তাদের বিষদাঁতের মধ্যে দিয়ে বিষ শিকারের শরীরে ঢুকিয়ে দেয়। কাজের উপর ভিত্তি করে সাপের বিষকে দুইভাগে ভগ করা যায় ঃ

- নিউরোটক্সিক বিষ (Neurotoxic Venom) ঃ

এই বিষ রক্তের মাধ্যমে প্রাণীদেহে ছড়িয়ে পড়ে এবং স্নায়ু উদ্দীপনা পরিবহনে বাধার সৃষ্টি করে। এর ফলে শরীরের অধিকাংশ মাংসপেশী ধীরে ধীরে অবশ হয়ে যায়। বিষক্রিয়া বেশি হলে বা বিষ তীব্র হলে আক্রান্ত মানুষ অথবা প্রাণী কয়েক মিনিট হতে কয়েক ঘন্টার মধ্যে মারা যেতে পারে। গোখরা, কেউটে, কয়েকটি সামুদ্রিক সাপের কামড়ে এই ধরণের বিষ পাওয়া যায়। গোখরা ও কেউটে সাপের নিউরোটক্সিক বিষের নাম যথাক্রমে α-Cobratoxin এবং α-Bungarotoxin।

- সাইটোটক্সিক বিষ (Cytotoxic Venom) ঃ

এই বিষ কামড়ের স্থানের কোষ ও কলা নষ্ট করে। ফলে কাটা স্থানে তীব্র ব্যথার অনুভূতি তৈরি হয় যা ছড়িয়ে পড়ে। আক্রান্ত অংশের মাংস ও চামড়া ফুলে উঠে, কাল হয়ে যায় ও নষ্ট হয়ে যায়। এই বিষ রক্তে শোষিত হয়ে সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে বিভিন্ন জটিলতা তৈরি হয় যেমন শরীরের অনেক স্থানে রক্তনালী নষ্ট হয়ে রক্তপাত হওয়া, রক্ত জমাট বাধা, কিডনি ও হৃদ্‌পিন্ড বিকল হওয়া ইত্যাদি। এই বিষে আক্রান্ত ব্যক্তি বা প্রাণী ভয়ানক কষ্ট পেয়ে মারা যায়। চন্দ্রবোড়া সাপে এই বিষ থাকে।

সাপে কাটা রোগীর উপসর্গসমূহ

সাপের ধরণ ও প্রয়োগকৃত বিষের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে সাপে কাটা রোগীর বিভিন্ন রকম উপসর্গ দেখা দেয়। এগুলোকে দুই ভাগে আলোচনা করা যায় ঃ

ক) কাটা-স্থানে স্থানীয় প্রতিক্রিয়া ঃ

- কাটা স্থানে ব্যথা, রক্ত বের হওয়া, ফুলে ওঠা, চামড়ার নীচে রক্ত জমা
- কাটা স্থানে সাপের দাঁতের তৈরি দাগ
- অনেক সময় কাটা স্থানে ফোস্কা ওঠতে পারে
- কাটা স্থানে জীবাণুর সংক্রমণ
- কাটা স্থানে মাংসে পচন ধরা, কাল হয়ে যাওয়া ও তীব্র ব্যথা হওয়া

খ) সারা দেহে প্রতিক্রিয়া ঃ

- বমি বমি ভাব, বমি হওয়া, পেট ব্যথা, দুর্বলতা, মাথা ঘোরানো
- দৃষ্টি ঝাপসা হওয়া, ডাবল ভিশন, মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়া, বুক ধড়ফড় করা, রক্তচাপ কমে যাওয়া,
- শ্বাস নেয়ার অক্ষমতা ও তীব্র শ্বাসকষ্ট
- শরীরের বিভিন্ন স্থান হতে রক্তপাত হওয়া যেমন চামড়ার নীচে, মাড়ি, নাকের ছিদ্র, শ্বাসনালী, খাদ্যনালী, মূত্রনালী, মস্তিষ্কের অভ্যন্তর, কনজাংকটিভা ইত্যাদি
- শরীরে ঝিম ধরা, হাত-পা ও অন্যান্য স্থান অবশ হওয়া, নড়াচড়া করতে অক্ষমতা, চোখের পাতা ভারী ভারী লাগা, চোখে ঝাপসা দেখা, ঢোক গিলতে কষ্ট হওয়া
- ঘাড়ের মাংশপেশী অবশ হয়ে যাওয়া ও ঘাড় সোজা রাখতে না পারা
- মাংসে পচন ধরা হতে বিভিন্ন জটিলতা তৈরি হওয়া যেমন কিডনি বিকল, আয়ন ভারসাম্যের অনিয়ন্ত্রন, হৃদপিন্ডের ক্রিয়া বন্ধ হওয়া

বিষধর সাপের কামড়ের সাধারণ প্রতিক্রিয়াগুলো হচ্ছে কাটা স্থান দ্রুত ফুল যাওয়া এবং তা খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়া, কাটা স্থানের নিকটস্থ লসিকাগ্রন্থি ফুলে যাওয়া, দ্রুত সারা দেহে সাধারণ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়া (যেমন তীব্র শ্বাসকষ্ট, রক্তচাপ কমে যাওয়া, দেহের তাপমাত্রা কমে যাওয়া, চোখের পাতা ভারী লাগা, অতিরিক্ত ঝিমুনি আসা, চোখে ঝাপসা দেখা), কোন ধরণের আঘাত ছাড়াই শরীরের বিভিন্ন স্থান হতে রক্তপাত হওয়া ও রক্তলাল প্রস্রাব হওয়া ইত্যাদি।

সাপের কামড়ের প্রাথমিক চিকিৎসা

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে সাপে কাটা রোগীর চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন এলাকায় নানা ধরণের চিকিৎসা চালু আছে যেমন ওঝা দিয়ে তন্ত্র-মন্ত্র ও ঝাঁড়-ফোক, বিভিন্ন গাছের নির্যাস খাওয়ানো, সাপে কাটা স্থান কেটে বা চিড়ে ফেলা ইত্যাদি। এগুলো আসলে অপচিকিৎসার নামান্তর। সাপে কাটা রোগীর প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য নীচের পদ্ধতিগুলো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মেনে চলা উচিত ঃ

কয়েকটি বিষধর সাপ ঃ

ডোরা কাটা কেউটে বা শঙ্খিনী

ব্ল্যাক মাম্বা

সাধারণ কেউটে

ভারতীয় গোখরা

ইনল্যান্ড টাইপান

পদ্ম গোখরা বা শঙ্খচূড়

র‍্যাটল স্নেক

চন্দ্রবোড়া

- যেহেতু অধিকাংশ সাপে কাটার ঘটনাই ঘটে নির্বিষ সাপের দ্বারা, তাই আতংকিত না হওয়াই প্রধান কর্তব্য। নির্বিষ সাপে কাটার পরও আতংকিত হয়ে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে অনেক মানুষ মারা যায়।
- যে হাতে বা পায়ে সাপে কেটেছে তা নড়াচড়া করা উচিত নয়। কারণ, নড়াচড়া করলে রক্তে বিষের শোষণ বেড়ে যায়।
- এরপর কাটা স্থান এন্টিসেপটিক যেমন পভিডোন আয়োডিন দিয়ে ভালভাবে পরিষ্কার করে খুব সাবধানে পরীক্ষা করতে হবে। যদি নির্বিষ সাপের কামড় হয় তবে চিন্তার কিছু নেই। যদি বিষধর সাপের কামড় হয় তবে কাটা স্থানের কিছুটা উপরে নরম কিন্তু অপেক্ষাকৃত চওড়া কাপড় যেমন গামছা, তোয়ালে, ওড়না, লুঙ্গি ইত্যাদি দিয়ে অল্প চাপে পেঁচিয়ে বেঁধে ফেলতে হবে। কাটা স্থানের উপরের দিকে বিষ ছড়িয়ে পড়া প্রতিরোধে এটাই যথেষ্ট। তবে দড়ি বা তারজাতীয় চিকন কোন জিনিস ব্যবহার করা উচিত নয়। কারণ এগুলো অত্যধিক চাপ তৈরি করে এবং কাটা স্থানের নীচের অংশে রক্ত চলাচল বন্ধ করে দেয়। বাঁধা স্থানের নীচের অংশ ধীরে ধীরে নীল হতে থাকলে বুঝতে হবে রক্ত চলাচলে সমস্যা হচ্ছে। এভাবে বেশিক্ষণ থাকলে হাতে বা পায়ে পচন ধরতে পারে।
- তবে যদি সাপের কামড়ের দাগ দেখে সাপের ধরণ সম্পর্কে নিশ্চিত না হওয়া যায় তবে কাটা স্থানের কিছুটা উপরে অল্প চাপে পেঁচিয়ে বেঁধে ফেলতে হবে। সাপের ওঝা দিয়ে ঝাঁড়-ফোক করে সময় নষ্ট না করে রোগীকে দ্রুত নিকটস্থ হাসপাতালে বা চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যেতে হবে। কারণ নির্বিষ সাপে কাটলে রোগী এমনিতেই ভাল হয়ে যায় আর বিষধর সাপে কাটলে ঝাঁড়-ফোক কোন কাজে আসবে না। হাসপাতালে নেয়ার ক্ষেত্রে কোনভাবেই দেরি করা যাবে না।
- কাটা স্থান কখনোই কেটে বা চিড়ে বা কাটা স্থান হতে চুষে রক্ত বের করা যাবে না। বিভিন্ন গাছের কাটা বা মাছের কাটা দিয়ে সাপে কাটা স্থান আঘাত করে রক্ত বের করা যাবেনা। এতে কাটা স্থানে জীবাণুর সংক্রমণ বেড়ে যায় যা পরবর্তীতে অনেক সমস্যা তৈরি করে।
- যদি কামড় দেয়ার পর সাপটিকে মেরে ফেলা সম্ভব হয় তবে সেটিকে সাথে করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া উচিত। কারণ চিকিৎসকবৃন্দ অনেকসময় সাপ দেখে এর ধরণ ও বিষের প্রকৃতি বুঝতে পারেন । তখন সাপে কাটা রোগীর চিকিৎসাও অনেকটা সহজ হয়ে যায়।

হাসপাতালে সাপে কাটা রোগীর চিকিৎসা

- প্রথমে রোগী বা রোগীর সাথে আসা লোকের কাছ হতে সাপে কাটার পুরো ঘটনার বিবরণ (কখন, কোথায়, কিভাবে, শরীরের কোন স্থানে) শুনতে হবে। সাধারণত রাতের বেলা কেউটে সাপ, ফসলের ক্ষেতে গোখরা ও চন্দ্রবোড়া সাপ, গাছে টিয়া সাপ বেশি কামড়ায়। কেউ সাপটি দেখে থাকলে বা মেরে থাকলে তার বিবরণ জেনে নিতে হবে। এভাবে অনেক সময় সাপটিকে চিহ্নিত করা যায়।
- রোগীর সার্বিক অবস্থা যেমন নাড়িস্পন্দন, রক্তচাপ, তাপমাত্রা, নিঃশ্বাসের হার, সচেতনতার মাত্রা ইত্যাদি পরীক্ষা করে দেখতে হবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।
- যদি নির্বিষ সাপের কামড় হয় তবে সাধারণত অ্যান্টিবায়োটিক ও ব্যথার ঔষধই যথেষ্ট। অনেক চিকিৎসক টিটেনাস প্রতিরোধে টিটি ও টিআইজি ইঞ্জেকশন দেয়ার পরামর্শ দেন।
- বিষধর সাপের কামড়ের জন্য পলিভ্যালেন্ট অ্যান্টিভেনোম ইঞ্জেকশন সবচেয়ে কার্যকরী চিকিৎসা। এটি অনেক দামী এবং সবসময় সহজলভ্যও নয়। ১০টি ভায়াল বা অ্যাম্পুল ২৫০-৫০০ মিলি লিটার নরমাল স্যালাইনে মিশিয়ে শিরায় খুব ধীরে ধীরে কয়েক ঘন্টায় দিতে হয়। যেহেতু বয়স নির্বিশেষে সাপ সবাইকে প্রায় একই পরিমাণ বিষ প্রয়োগ করে, তাই বাচ্চা ও বড়দের একই ডোজে ইঞ্জেকশন দিতে হয়। এটি প্রাণিদেহে তৈরি করা হয়। তাই এটি প্রয়োগ করার আগে এর প্রতি সংবেদনশীলতা পরীক্ষা করে নিতে হবে। অ্যালার্জিজনিত সমস্যা হলে তা মোকাবেলার জন্য অ্যান্টিভেনোম প্রয়োগের আগে হাতে এডরিনালিন (এপিনেফ্রিন), স্টেরয়েড ও অ্যান্টিহিস্টামিন ইঞ্জেকশন প্রস্তুত রাখতে হবে।

> কাঁচের তৈরি পরীক্ষানলে (Test tube) রক্ত পরীক্ষা করে অনেক সময় সাপের বিষের প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। যদি ২০ মিনিট কক্ষ তাপমাত্রায় রেখে দেয়ার পরও পরীক্ষানলের রক্ত জমাট না বাঁধে তাহলে সাইটোটক্সিক বিষের উপস্থিতির ব্যাপারে ধারণা করা যায়।

- অনেক ক্ষেত্রেই অ্যান্টিভেনোম ছাড়াও রোগীর জন্য নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (Intensive Care Unit) চিকিৎসার প্রয়োজন হয় যেমন রক্তচাপ অত্যধিক কমে গেলে, সারা দেহে রক্তপ্রবাহ কমে গেলে (Circulatory Shock), তীব্র শ্বাস কষ্ট বা শ্বাস বন্ধ হয়ে আসলে, হৃদ্‌পিন্ডের ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটলে, রক্তে লবণের ভারসাম্য মারাত্মকভাবে নষ্ট হলে বা আকস্মিক কিডনী বিকল হলে।
- চন্দ্রবোড়া সাপের কামড়ে কিডনী বিকল হতে পারে। সেক্ষেত্রে ডায়ালাইসিসের প্রয়োজন হয়।
- যদি কাটা স্থান ফুলে ওঠে তীব্র ব্যথা তৈরি করে তাহলে অপারেশন করে সেই স্থানের ফোলা কমাতে হয়। এই অপারেশনের নাম Fasciotomy। এটি না করলে ফোলা অংশের নিম্নস্থ পেশী ও স্নায়ু নষ্ট হয়ে যেতে হবে।
- রক্তপাত বেশি হলে শিরায় নরমাল স্যালাইন, ফ্রেশ ফ্রোজেন পাজমা, প্লেটলেট বা রক্ত দেয়া লাগতে পারে।

সাপে কাটা প্রতিরোধের জন্য প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা

সাপের আচার-আচরণ জেনে সাধারণ কিছু সাবধানতা অবলম্বন করলেই সাপে কাটার হাত থেকে মুক্ত থাকা যায়।

- কোন এলাকায় কি ধরণের সাপ পাওয়া যায় তা জানা, সম্ভাব্য আবাসস্থল চিহ্নিত করা, কামড়ানোর সময় জানা
- বসতঘরে হাঁস-মুরগি না রেখে আলাদাভাবে তৈরি সুরক্ষিত ঘরে রাখা
- বসতঘরে, গোলাঘরে ও গোয়ালঘরে ইঁদুরের গর্ত থাকলে সেগুলো বন্ধ করা
- মাটির ঘরে দেয়ালের বা মেঝের ফাঁক-ফোকর বন্ধ করা এবং মাটিতে না ঘুমানো
- ঘর-বাড়ির কাছাকাছি খড়ের গাদা, ঝোঁপ-ঝাড়, ইট-কাঠের স্তূপ পরিষ্কার রাখা
- রাতের বেলা বাড়ির চারপাশে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা এবং অন্ধকারে টর্চলাইট ব্যবহার করা (বিশেষ করে বৃষ্টির পর পর)
- কোন গর্তে বা ফাঁক-ফোকরে হাত না ঢোকানো

তথ্যসূত্র

❑ স্কয়ার

কোষ্ঠকাঠিন্য

আমরা দৈনন্দিন যেসব খাবার গ্রহণ করি তার কিছু অংশ পরিপাকতন্ত্রে পরিপাক হয়না। খাদ্যের অপাচ্য অংশ ও কিছু বর্জ্য পদার্থ মল হিসেবে দেহ থেকে নির্গত হয়। মানুষ সাধারণত দিনে তিনবার থেকে প্রতি দুই দিনে একবার মলত্যাগ করে। এটাই মলত্যাগের স্বাভাবিক হার। যদি কোন ব্যক্তি নিয়মিতভাবে প্রতি দুই দিনেও একবার মলত্যাগ না করে তবে তার কোষ্টকাঠিন্য হয়েছে বলে ধরে নেয়া হয়। যদিও মানুষ কোষ্ঠকাঠিন্য বলতে সাধারণত অত্যধিক শক্ত মল ত্যাগ করাকে বোঝায়।

কোষ্ঠকাঠিন্য একটি অতি পরিচিত স্বাস্থ্য-সমস্যা। যেকোন বয়সের মানুষ এই সমস্যায় আক্রান্ত হতে পারে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে খ্যাদ্যাভ্যাস ও কয়েকটি সাধারণ অসুখের সাথে কোষ্ঠকাঠিন্য থাকতে পারে। আবার অনেক সময় এই সমস্যাটি বৃহদান্ত্র ও মলাশয়ের ক্যান্সারের সাথে যুক্ত থাকে।

কারণ

- আঁশযুক্ত খাবার এবং শাক-সবজি কম পরিমাণে খাওয়া
- কম পরিমাণে পানি পান করা
- কায়িক পরিশ্রমের অভাব
- দীর্ঘদিন শয্যাশায়ী থাকা
- গর্ভাবস্থা
- ডায়াবেটিস
- অন্ত্রনালীতে ক্যানসার
- পেটের বিভিন্ন টিউমার
- স্ট্রোক
- বিভিন্ন ধরনের ঔষধের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া
- মস্তিস্কে টিউমার
- অত্যধিক দুঃশ্চিন্তা

লক্ষণ

- অনিয়মিত মল ত্যাগ করা
- শক্ত ও কঠিন মল ত্যাগ করা
- মলত্যাগে অনেক বেশী সময় ও চাপের প্রয়োজন হওয়া
- অধিক সময় ধরে মলত্যাগ করার পরও তা অসম্পূর্ন মনে হওয়া
- মলদ্বারের আশে-পাশে ও তলপেটে ব্যথা করা
- প্রায়ই আঙ্গুল বা সাপোজিটরি বা অন্য কোনও মাধ্যমে মল বের করার চেষ্টা করা

জটিলতা

কোষ্ঠকাঠিন্য একটি সাধারণ সমস্যা হলেও ঠিকমত চিকিৎসা না হলে অনেক জটিলতা তৈরি হয়। যেমনঃ

- পাইলস্ বা পায়খানার সাথে রক্ত পড়া
- এনাল ফিসার বা পায়খানার রাস্তায় ক্ষত তৈরি হওয়া
- এনোরেক্টাল প্রল্যাপস্ বা মলত্যাগের সময় মলাশয় বাইরে বের হয়ে যাওয়া
- এনোরেক্টাল অ্যাবসেস বা পায়খানার রাস্তায় ফোঁড়া হওয়া
- অনেক সময় মলাশয়ে ক্যান্সার হওয়া

পরীক্ষা-নিরীক্ষা

কোষ্ঠকাঠিন্যে ভুগতে থাকা রোগীর বেশি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার প্রয়োজন হয়না। স্বল্পমেয়াদী কোষ্ঠকাঠিন্য সহজেই ভাল হয়ে যায়। তবে সমস্যা দীর্ঘমেয়াদী হলে এবং বাচ্চা ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের ক্ষেত্রে কিছু পরীক্ষার প্রয়োজন হয় (যেমন এন্ডোস্কপি, কোলনোস্কপি, পেটের এক্সরে, পেটের আল্ট্রাসনোগ্রাম, মল পরীক্ষা ইত্যাদি)। পরিপাকনালীর কোথাও ক্যান্সার হলে বা পেটের কোন টিউমার অত্যধিক বড় হয়ে পরিপাকনালীর উপর চাপ প্রয়োগ করলে কোষ্ঠকাঠিন্য হয়। এই রোগগুলো নির্ণয়ের জন্য অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

চিকিৎসা

কোষ্ঠকাঠিন্য একটি দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্য-সমস্যা। ধৈর্য্যের সাথে কিছু নিয়ম মেনে চলা এই রোগের প্রধান চিকিৎসা। তবে নিয়ম মেনে চলার পাশাপাশি প্রায়ই ঔষধ ব্যবহারের প্রয়োজন হয়।

ক) খ্যাদ্যাভ্যাস ও জীবন-পদ্ধতিঃ

- নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম করা
- বেশী করে শাক-সবজি ও আঁশযুক্ত খাবার খাওয়া
- বেশী বেশী পানি পান করা
- নিয়মিত মল ত্যাগ এর অভ্যাস করা
- দুঃশ্চিন্তা দূর করা
- যারা সারা দিন বসে কাজ করেন তাদের নিয়মিত ব্যায়াম করা

খ) কার্যকরী ঔষধঃ

- ইসবগুলের ভুষি
- ল্যাকটোলুজ
- মিল্ক অব ম্যাগনেসিয়া
- মিল্ক অব ম্যাগনেসিয়া ও লিকুইড প্যারাফিন
- সরবিটল

এসব ঔষধ সাধারণত রাতের বেলা ঘুমানোর আগে ব্যবহার করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। তবে এগুলো দীর্ঘদিন ব্যবহার করা উচিত নয়। কারণ, দীর্ঘদিন ব্যবহারে ঔষধের প্রতি রোগীর মানসিক নির্ভরশীলতা তৈরি হয়। এসব ঔষধ অতি ব্যবহারে পাতলা পায়খানা হতে পারে। যদি কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা দীর্ঘায়িত হয়, কোষ্ঠকাঠিন্যের সাথে ক্রমাগত শরীরের ওজন কমতে থাকে বা উপরে বর্ণিত কোন জটিলতা দেখা দেয় তাহলে অতিসত্তর চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

তথ্যসূত্র

❑ স্কয়ার

টিকাদান কর্মসূচি

পৃথিবীব্যাপী প্রতিবছর বিভিন্ন সংক্রামক রোগে (Infectious Diseases) আক্রান্ত হয়ে লাখ লাখ মানুষ প্রাণ হারায়। এসব রোগের বেশিরভাগই হয়ে থাকে তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশসমূহে। অশিক্ষা, কুসংস্কার, দারিদ্র, রাজনৈতিক গোলযোগ ইত্যাদি কারণে এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের অধিকাংশ দেশেই সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

কথায় বলে- "প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধই উত্তম"। স্বাস্থ্য-সচেতনতার পাশাপাশি সংক্রামক রোগ প্রতিরোধের অন্যতম প্রধান উপায় হল সময়মত টিকাদান (Vaccination)। যুগে যুগে বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রায় ২৫ টি রোগের প্রতিষেধক বা টিকা আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রতিবছর পৃথিবীতে কোটি কোটি শিশুকে এসব টিকা দেয়া হচ্ছে। ইউনিসেফ ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সহায়তায় দেশে দেশে টিকাদান কর্মসূচি চালু রয়েছে। টিকাদানের মাধ্যমে শিশু বিভিন্ন জীবনঘাতি রোগের আক্রমণ হতে রক্ষা পায়। বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয়ের মাধ্যমে সারা দেশে খুবই সফলভাবে টিকাদান কর্মসূচি বর্তমানে চলমান। এছাড়া ব্যক্তিগত উদ্যোগে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী অনেকেই টিকা নিয়ে থাকেন।

বাংলাদেশে টিকাদান কর্মসূচি

১৯৭৯ সালের ৭ এপ্রিল বাংলাদেশে সর্বপ্রথম সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি বা Expanded Program on Immunization (EPI) চালু হয়। প্রথম অবস্থায় যেসব শিশুর বয়স ১ বছরের কম তাদেরকে ৬ টি সংক্রামক রোগের টিকা দেয়া হয়। এ রোগগুলো হলো শিশুদের যক্ষা, পোলিওমাইলাইটিস, ডিফথেরিয়া, হুপিংকাশি, ধনুষ্টংকার এবং হাম। নিয়মিত টিকাদান কার্যক্রমের মাধ্যমে এই ৬টি রোগে মৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে।

শিশুদের টিকাদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্য ঈর্ষনীয়। ইতোমধ্যেই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (World Health Organization) বাংলাদেশকে "পোলিও রোগমুক্ত" ঘোষণা করেছে। মা ও নবজাতকের ধনুষ্টংকার রোগ দূর করার জন্য ২০০৮ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বাংলাদেশকে সনদ প্রদান করে। ২০১১ সালের হিসাব অনুযায়ী শতকরা ৯৫% ভাগের বেশি শিশু ডিপিটি (ডিফথেরিয়া, হুপিং কাশি, ধনুষ্টংকার) টিকার আওতায় এসেছে। ২০০৩ সাল থেকে বাংলাদেশে হেপাটাইটিস বি ভ্যাক্সিন এবং ২০০৯ সাল থেকে হিব্ (Haemophilus influenzae type b) ভ্যাক্সিন টিকাদান সূচিতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। ভবিষ্যতে আরও কয়েকটি টিকা সূচিতে যোগ হবে। তাছাড়া সরকারের সংক্রামক রোগ বিভাগ জলাতংক রোগের টিকার ব্যবস্থা করে থাকে। বেসরকারিভাবে আরও কিছু রোগের টিকা পাওয়া যায়।

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে সরকারীভাবে টিকাদান কেন্দ্রের মাধ্যমে টিকা দেয়া হয়। ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিটি ওয়ার্ডে একজন স্বাস্থ্য সহকারী (Health Assistant) ও একজন পরিবার কল্যাণ সহকারী (Family Welfare Assisstant) টিকাদান কর্মসূচি দেখাশোনা করেন। ওয়ার্ডের নির্দিষ্ট একটি স্থানকে টিকাদান কেন্দ্র হিসেবে ঠিক করা হয়। প্রতি মাসে একবার বাড়ি বাড়ি গিয়ে টিকাদান কর্মসূচিতে বাদ পড়া শিশুদের খোঁজে বের করে টিকা দেয়া হয়। জন্ম নিবন্ধন ও পরিবার পরিকল্পনা সেবাও টিকাদান কেন্দ্রের সাথে সমন্বয় করা হয়। শহরাঞ্চলে সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভা কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনায় টিকাদান কর্মসূচি পরিচালিত হয়। অনেক শহরে বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমেও এই কাজ করা হয়। গ্রামের মত শহরেও একটি নির্দিষ্ট স্থানে টিকাদান কেন্দ্র থাকে। শহরে বাদ পড়া শিশুদের প্রতি সপ্তাহে একবার বাড়ি গিয়ে টিকা দেয়া হয়।

গ্রামে ও শহরে নিয়মিত টিকাদান কর্মসূচির বাইরে বিভিন্ন সময় সরকারি ব্যবস্থাপনায় বিশেষ টিকাদান কর্মসূচি আয়োজন করা হয়। পোলিও টিকা খাওয়ানোর জন্য মাঝে-মধ্যেই বিশেষ দিন (জাতীয় টিকা দিবস) ঘোষণা করা হয়। হজ্জ গমনেচ্ছুক লোকজনকে সৌদি আরবে যাওয়ার আগে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাক্সিন, মেনিনজোকক্কাল ভ্যাক্সিন ইত্যাদি টিকা দেয়া হয়। বিদেশে কাজের জন্য যাওয়া লোকদের জন্য টিকার ব্যবস্থা করা স্বাস্থ্য মন্ত্রনালয়ের অঙ্গীকার।

চিত্রঃ শিশুদের টিকাদান

সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির অভীষ্ট জনগোষ্ঠী

কয়েকটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকে টিকাদানের লক্ষ্যে ইপিআই (EPI) পরিচালিত হয়। এরা হলঃ

- ০-১১ মাস বয়সী সকল শিশু
- ১৫ মাস বয়সী সকল শিশু
- ১৫ বছর বয়সী সকল কিশোরী
- ১৫-৪৯ বছর বয়সের সন্তান ধারণক্ষম সকল মহিলা

সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচিতে প্রদত্ত টিকাসমূহ

ইপিআই-তে বয়স ও লিঙ্গ-ভেদে বিভিন্ন বয়সে বেশ কয়েকটি টিকা দেয়া হয়। এই টিকাগুলো হচ্ছে বিসিজি টিকা (Bacillus Calmette-Guerin Vaccine) বা যক্ষা রোগের টিকা, পোলিও বা ওপিভি টিকা (Oral Polio Vaccine), পেন্টাভ্যালেন্ট টিকা (Pentavalent Vaccine), এমআর টিকা (Measles-Rubella Vaccine), হামের টিকা (Measles Vaccine) ও ধনুষ্টংকার বা টিটি টিকা (Tetanus Toxoid). পেন্টাভ্যালেন্ট টিকায় ৫টি বিভিন্ন রোগ যেমন ডিফথেরিয়া, হুপিং কাশি, ধনুষ্টংকার, হেপাটাইটিস-বি এবং হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জি-বি এর প্রতিষেধক টিকা একসাথে থাকে।

ক) ০-১১ মাস বয়সী শিশুদের টিকাদান কর্মসূচি ঃ

টিকার নাম	ডোজের সংখ্যা	সময়
বিসিজি	১	জন্মের পর
পেন্টাভ্যালেন্ট	৩	৬ সপ্তাহ, ১০ সপ্তাহ, ১৪ সপ্তাহ
ওপিভি	৪	৬ সপ্তাহ, ১০ সপ্তাহ, ১৪ সপ্তাহ; ৪র্থ ডোজটি এমআর টিকার সাথে দিতে হবে
এমআর	১	৯ মাস পূর্ণ হলে

- জন্মের ১৪ দিনের মধ্যে ওপিভির অতিরিক্ত ১টি ডোজ দেয়া যেতে পারে। পেন্টাভ্যালেন্ট ও পোলিও টিকার একটি ডোজ হতে পরবর্তী ডোজের মধ্যে বিরতি কমপক্ষে ২৮ দিন হতে হবে, তবে দুই ডোজের মধ্যে বিরতির নির্দিষ্ট সর্বোচ্চ সীমা নেই । বিরতি ২৮ দিনের কম হলে তা অকার্যকর টিকা হবে। নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী টিকা দেয়াই সবচেয়ে ভাল পন্থা।
- বিসিজি টিকা দেয়ার পরবর্তী সময়ে অন্য টিকা নিতে আসলে শিশুর বাম বাহু পরীক্ষা করে দেখতে হবে কোনো শক্ত দানা, দাগ বা ক্ষত চিহ্ন (scar) আছে কি না। শক্ত দানা, দাগ বা ক্ষত চিহ্ন থাকলে বুঝতে হবে বিসিজি টিকা সফলভাবে কাজ করেছে। যদি কোনো দাগ না হয় তাহলে পেন্টাভ্যালেন্ট টিকার ৩য় ডোজ দেয়ার সময় পুনরায় বিসিজি টিকা দিতে হবে।

খ) ১৫ মাস বয়সী শিশুদের টিকা ঃ

টিকার নাম	ডোজের সংখ্যা	সময়
হাম	১	১৫ মাস পূর্ণ হলে

আগে শিশুর বয়স ৯ মাস পূর্ণ হলে ১ বার হামের টিকা দেয়া হত। এখন শিশুর বয়স ৯ মাস পূর্ণ হলে এমআর (হাম ও রুবেলা) ও ১৫ মাস পূর্ণ হলে হামের টিকা দেয়া হয়।

গ) ১৫ বছর বয়সী কিশোরী ও ১৫-৪৯ বছর বয়সী মহিলাদের টিকা ঃ

টিকার নাম	ডোজের সংখ্যা	সময়
এমআর	১	১৫ বছর বয়সে ১ম ডোজ টিটি টিকার সাথে
টিটি	৫	টিটি-১: ১৫ বছর বয়সে
		টিটি-২: টিটি-১ পাওয়ার কমপক্ষে ২৮ দিন পর
		টিটি-৩: টিটি-২ পাওয়ার কমপক্ষে ৬ মাস পর
		টিটি-৪: টিটি-৩ পাওয়ার কমপক্ষে ১ বৎসর পর
		টিটি-৫: টিটি-৪ পাওয়ার কমপক্ষে ১ বৎসর পর

- ১৫ বছর বয়সের বেশি বয়সী কিশোরীকে কোনোক্রমেই এমআর টিকা দেয়া যাবে না।
- টিটি টিকার ক্ষেত্রে ১টি ডোজ হতে পরবর্তী ডোজের সময় অতিক্রান্ত হলেই কেবল টিকা দেয়া যাবে। এক্ষেত্রে দেরী হলে সমস্যা নেই। যেমন কোন মহিলা টিটি-২ পাওয়ার কমপক্ষে ৬ মাস পর টিটি-৩ টিকা পাওয়ার কথা। তিনি টিটি-২ পাওয়ার ৭ বা ৮ মাস পর টিকা নিতে পারবেন কিন্তু ৪ বা ৫ মাসে টিকা নিতে পারবেন না।
- যে সকল মেয়ে শিশু ইপিআই টিকাদান কর্মসূচি অনুযায়ী ডিপিটি/পেন্টাভ্যালেন্ট টিকার ৩ ডোজ সম্পন্ন করেছে তাদের ক্ষেত্রে ১৫ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার পর টিটি-৩ হতে টিকাদান শুরু করতে হবে অর্থাৎ ৫টি টিটির পরিবর্তে ৩টি টিটি টিকা দিতে হবে।

টিকা গ্রহণের সুবিধা

- জন্মের পরপরই ১ ডোজ বিসিজি টিকা দিয়ে শিশুকে যক্ষ্মা রোগ থেকে রক্ষা করা যায়।
- চার ডোজ পোলিও টিকা খাওয়ালে তা শিশুকে পোলিও রোগ থেকে রক্ষা করে।
- তিন ডোজ পেন্টাভ্যালেন্ট টিকা ডিফথেরিয়া, হুপিং কাশি, ধনুষ্টংকার, হেপাটাইটিস-বি ও হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জি-জনিত রোগ হতে রক্ষা করে।
- ৯ মাস বয়স পূর্ণ হলে এক ডোজ এমআর টিকা এবং ১৫ মাস বয়স পূর্ণ হলে হামের ২য় ডোজ টিকা দিয়ে শিশুকে হাম ও রুবেলা রোগ থেকে প্রতিরোধ করা যায়।
- ১৫ বৎসর বয়স পূর্ণ হলে সকল কিশোরীকে ১ ডোজ এমআর টিকা দিয়ে রুবেলা রোগ রোধ করা যায়।
- ১৫-৪৯ বছর বয়সের সন্তান ধারণে সক্ষম সকল মহিলাকে সময়সূচি অনুযায়ী ৫ ডোজ টিটি টিকা দিয়ে মা ও নবজাতকের ধনুষ্টংকার রোগ রোধ করা যায়।

টিকাদান পরবর্তী জটিলতা

টিকা দেয়ার পর শিশুর সামান্য স্বাস্থ্য-সমস্যা দেখা দিতে পারে। এজন্য অনেক বাবা-মা শিশুকে ১টি বা ২টি টিকা দেয়ার পর টিকা দেয়া বন্ধ করে দেন। আসলে এসব সমস্যা নিয়ে চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই। টিকা দেয়ার পর সংঘটিত স্বাস্থ্য-সমস্যা ও করণীয় নিম্নরূপ ঃ

- পোলিও টিকার কোন পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া নেই।
- বিসিজি টিকা দেয়ার ২-৩ সপ্তাহ পর টিকার স্থানে শক্ত দানা, ক্ষত বা ঘা হয়। এজন্য ক্ষতস্থানে কোন ওষুধ বা তেল দেয়া যাবে না। এই ক্ষত আপনা-আপনিই শুকিয়ে যায়। তবে ক্ষতস্থানে দাগ থেকে যায়।
- পেন্টাভ্যালেন্ট ও টিটি টিকা দেয়ার ২-৩ দিন পর সামান্য জ্বর হতে পারে এবং টিকার স্থানে সামান্য লাল, ফোলা এবং ব্যথা হতে পারে। এই সমস্যা কিছুদিনের মধ্যে ভালো হয়ে যায়। শিশুকে বার বার মায়ের দুধ খাওয়াতে হবে।
- এমআর ও হামের টিকা দেয়ার পর টিকার স্থানে সামান্য লাল, ফোলা এবং ব্যথা হতে পারে। টিকা দেয়ার পর সামান্য জ্বর, অস্থিরতা ও শরীরে সামান্য দানা দেখা দিতে পারে। এজন্য কোনো চিকিৎসার প্রয়োজন নেই। ব্যথা এমনিতেই সেরে যায়। শিশুকে বার বার মায়ের দুধ খাওয়াতে হবে। এছাড়া স্বাভাবিক খাবারের পাশাপাশি প্রচুর পরিমাণ তরল খাদ্য দিতে হবে।

সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির বাইরে অন্যান্য টিকা

জলাতংক (Rabies) রোগের টিকা ঃ

Rabies ভাইরাসে আক্রান্ত প্রাণী যেমন মানুষ, কুকুর, বিড়াল, গরু, ছাগল, মহিষ, ভেড়া, ঘোড়া, গাধা, উট, শিয়াল, শুকর, বাঁদর মস্তিষ্কের প্রদাহে (Encephalitis) ভুগে। এই রোগে আক্রান্ত প্রাণী অস্বাভাবিক ও আক্রমণাত্মক আচরণ করে। এরা অন্য কোন প্রাণীকে কামড়ালে জলাতংক বা Rabies রোগ হতে পারে। কামড়ানো

ছাড়াও অসুস্থ প্রাণীর আঁচড় বা শরীরের কোন কাটা স্থানে অসুস্থ প্রাণীর লালার স্পর্শ হতেও জলাতংক হতে পারে। আক্রান্ত প্রাণীর দেহে ভাইরাস প্রবেশ করার পর থেকে রোগ-লক্ষণ দেখা দিতে প্রায় ১-৩ মাস সময় লাগতে পারে। তাই দ্রুত টিকা দেয়া শুরু করলে অসুস্থ প্রাণীর কামড় বা আঁচড়ের পরও জলাতংক রোগ প্রতিরোধ করা যায়। তাছাড়া, কামড়ানোর আগেও টিকা নিয়ে নিরাপদে থাকা যায়।

ক) জলাতংক রোগে আক্রান্ত প্রাণী দ্বারা কামড়ানো বা আঁচড়ানোর পর টিকা ঃ

কামড়ানোর পর কাটা স্থান পরিষ্কার পানি দিয়ে ভালভাবে ধুয়ে নিতে হবে। কাটা স্থান কখনোই সেলাই করা বা ব্যান্ডেজ করা যাবে না। জলাতংক রোগের টিকা কয়েক ধরণের। Human Diploid Cell Vaccine, Purified Chick Embryo Vaccine, Purified Vero Cell Vaccine - এই টিকাগুলো বেসরকারিভাবে পাওয়া যায়। এদের সবগুলো ৫ ডোজ ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে কামড়ানোর ০, ৩, ৭, ১৪ এবং ৩০ তম দিনে দিতে হয়। অনেক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ৯০ তম দিনে ১ টি বুস্টার টিকা দেয়ার পরামর্শও দিয়ে থাকেন। সরকারিভাবে এখনো Nerve Tissue Vaccine পাওয়া যায়। চামড়ার নীচে ১৪ টি ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে এই টিকা নিতে হয়। এটি জলাতংক প্রতিরোধে কার্যকরী হলেও এর কিছু মারাত্মক পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া হওয়ার সম্ভাবনার জন্য পৃথিবীর অনেক দেশেই এটি আর পাওয়া যায় না।

কামড়ের মাত্রা যদি তীব্র হয় তাহলে টিকার পাশাপাশি কামড়ানোর ৭ দিনের মধ্যে ১ ডোজ Rabies Immune Globulin বা আরআইজি নিতে হয়। তবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এটি নেয়া উচিত। শরীরের ওজন অনুযায়ী ২০ ইউনিট/কেজি হিসেবে এটি মাংশপেশীতে দিতে হয়। সম্পূর্ণ ডোজের অর্ধেক আক্রান্ত স্থানে ও বাকি অর্ধেক হাতের বা পায়ের মাংসপেশীতে দিতে হবে। একই হাত বা পায়ে টিকা ও আরআইজি দেয়া যাবে না।

খ) জলাতংক রোগে আক্রান্ত প্রাণী দ্বারা কামড়ানোর আগে টিকা ঃ

কিছু লোকজন প্রাণীদের সংস্পর্শে অনেক সময় ব্যয় করেন। পশুচিকিৎসক, প্রাণী নিয়ে যারা গবেষণা করেন, বাণিজ্যিক পশুপালনে কর্মরত লোকজন, বাড়িতে যারা পশু পালন করেন, জলাতংক-আক্রান্ত প্রাণী নিয়ে পরীক্ষাগারে যারা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন তারা জলাতংকে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিতে থাকেন। তারা আগে থেকেই টিকা নিয়ে নিরাপদে থাকতে পারেন। তিন ডোজ টিকা ০, ৭ ও ২১-২৮ তম দিনে নিতে হয়। ঝুঁকিপূর্ণ পেশার ব্যক্তিদের ২ বছর পর পর বুস্টার ডোজ নেয়া উচিত। আগে টিকা নেয়া ব্যক্তিকে জলাতংক রোগে আক্রান্ত প্রাণী কামড় বা আঁচড় দিলে তিন দিনের ব্যবধানে দুই ডোজ টিকা নিলেই চলবে।

হেপাটাইটিস এ ভাইরাসের (Hepatitis A Virus) টিকা ঃ

হেপাটাইটিস এ ভাইরাস সারা পৃথিবীব্যাপী জন্ডিসের অন্যতম প্রধান কারণ। স্কুলগামী শিশুরা বেশি আক্রান্ত হলেও যেকোন বয়সের মানুষ এই ভাইরাসে আক্রান্ত হতে পারে। মাঝে মাঝে কোথাও কোথাও একসাথে অনেক মানুষ আক্রান্ত হতে পারে। হেপাটাইটিস এ ভাইরাসটি পানি ও খাদ্যের মাধ্যমে ছড়ায়। এই ভাইরাস যকৃতকে সংক্রমণ করলেও হেপাটাইটিস বি, সি বা ডি ভাইরাসের মত দীর্ঘমেয়াদী জটিলতা যেমন লিভার সিরোসিস, লিভার ক্যানসার ইত্যাদির জন্য দায়ী নয়। শিশুর বয়স ২ বছর হলে ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে হেপাটাইটিস এ ভাইরাসের ১ম ডোজ টিকা নেয়া উচিত। তবে কোন কারণে দেরি হলেও পরে টিকা নেয়া উচিত। ২য় ডোজটি ১ম ডোজের ৬-১২ মাস পর নেয়া যায়। দুই ডোজ টিকা নেয়ার পর প্রায় ৯৭-৯৯% সুরক্ষা পাওয়া যায়।

হেপাটাইটিস বি ভাইরাসের (Hepatitis B Virus) টিকা ঃ

সারা পৃথিবীব্যাপী লিভার সিরোসিসের প্রধান কারণ হেপাটাইটিস বি ভাইরাস। প্রতিবছর পৃথিবীতে প্রায় ৩৫ কোটি লোক এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়। শুরুতে জন্ডিস সৃষ্টির জন্য দায়ী হলেও এই ভাইরাস পরবর্তীতে যকৃতে বিভিন্ন দীর্ঘমেয়াদী সমস্যার সৃষ্টি করে যেমন লিভার সিরোসিস, লিভার ক্যানসার। এসব সমস্যায় প্রতিবছর পৃথিবীব্যাপী প্রায় ১০ লাখ লোক মারা যায়। পরীক্ষা ছাড়া রক্ত সঞ্চালন, অনিরাপদ যৌন সম্পর্ক ও নেশাদ্রব্য গ্রহণের জন্য একই সিরিঞ্জ অনেকে ব্যবহারের মাধ্যমে হেপাটাইটিস বি ভাইরাস ছড়ায়।

যেকোন বয়সেই হেপাটাইটিস বি ভাইরাসের টিকা নেয়া যায়। ইপিআই-তে ৬ সপ্তাহ বয়সে যে পেন্টাভ্যালেন্ট টিকা দেয়া হয় তার মধ্যে হেপাটাইটিস বি ভাইরাসের টিকা অন্তর্ভূক্ত। ইপিআই-তে টিকা দেয়া না হলে পরেও দেয়া যায়। এক্ষেত্রে ০, ৩ ও ৬ মাসে তিনটি টিকা নিতে হয়। ২০ বছরের কম বয়সীদের জন্য প্রতিটি ডোজ ০.৫ মিলি এবং ২০ বছর বা এর বেশি বয়সীদের জন্য প্রতিটি ডোজ ১ মিলি দিতে হয়। টিকা দিয়ে প্রায় ৯৫% ক্ষেত্রে হেপাটাইটিস বি রোধ করা যায়।

রোটাভাইরাসের (Rotavirus) টিকা ঃ

রোটাভাইরাস শিশুদের ডায়রিয়ার প্রধান কারণ। প্রতিবছর লাখ লাখ শিশু রোটাভাইরাস-জনিত ডায়রিয়ায় মারা যায়। রোটাভাইরাস-জনিত ডায়রিয়া প্রতিরোধে টিকা খুবই কার্যকরী। বর্তমানে ২ ধরণের টিকা পাওয়া যায় যা মুখে খেতে হয়। একটি টিকা ৩ ডোজ নিতে হয়। শিশুর ২ মাস, ৪ মাস ও ৬ মাস বয়সে এই টিকা নেয়া উচিত। অপর টিকার ডোজ ২ টি যা ২ মাস ও ৪ মাস বয়সে নেয়া উচিত। তবে শিশুর ৬-১৪ সপ্তাহ বয়সের মধ্যে যেকোন সময় টিকাদান শুরু অন্যান্য টিকা দেয়ার সময়ও দেয়া যায়।

এই টিকা নেয়ার ৭ দিনের মধ্যে শিশুর মৃদু ও স্বল্পস্থায়ী ডায়রিয়া হতে পারে। এসময় শিশুকে বেশি বেশি বুকের দুধ ও তরল খাবার দিতে হবে। এই ডায়রিয়া দ্রুতই সেরে যায়।

ধনুষ্টংকারের (Tetanus) টিকা ঃ

Clostridium tetani নামক ব্যাকটেরিয়া দ্বারা কেটে যাওয়া কোন স্থান সংক্রমিত হলে ধনুষ্টংকার রোগ হয়। এই রোগে মৃত্যুর হার অত্যধিক। ১ বছরের কম বয়সী শিশুরা সাধারণত ইপিআই-অনুযায়ী পেন্টাভ্যালেন্ট টিকা নিয়ে থাকে যা তাদেরকে ধনুষ্টংকার হতে ৫ বছর নিরাপদ রাখে। এরপর দুটি বুস্টার টিকা নেয়া উচিত। অতিরিক্ত এই দুটি টিকার প্রথমটি স্কুলে প্রবেশের সময় (৪০ মাস হতে ৬০ মাস বয়সে) এবং দ্বিতীয়টি ১৩-১৮ বছর বয়সে নেয়া উচিত। তাহলে সারাজীবন ধনুষ্টংকারের হাত থেকে নিরাপত্তা পাওয়া যায়।

পরবর্তীতে শরীরের কোন অংশ কেটে গেলে টিটি টিকার কথা নিম্নে বর্ণিত উপায়ে বিবেচনা করতে হবে ঃ

- যদি কোন ব্যক্তির ইপিআই-অনুযায়ী পেন্টাভ্যালেন্ট বা ডিপিটি টিকা এবং বুস্টার টিকা নেয়া থাকে এবং ধারালো, পরিষ্কার যন্ত্র দিয়ে কোন স্থান কেটে যায় ও কাটাস্থান মাটি বা কোন ধরনের ময়লার সংস্পর্শে না আসে, তাহলে নতুন করে টিটি টিকা দেয়ার প্রয়োজন নেই।
- যদি কোন ব্যক্তি ইপিআই-অনুযায়ী পেন্টাভ্যালেন্ট বা ডিপিটি টিকা নিয়ে থাকে কিন্তু বুস্টার টিকা না নিয়ে থাকে এবং পুরনো, মরচে-ধরা ধাতব বস্তু দিয়ে কেটে যায় বা পরিষ্কার, ধারালো যন্ত্র (ব্লেড, ছুরি, কাঁচি) দিয়ে কেটে যাওয়ার পর কাটা অংশ মাটির সংস্পর্শে আসে, তাহলে তাকে ১ ডোজ টিটি টিকা নিতে হবে।
- যদি কোন ব্যক্তি ইপিআই-অনুযায়ী পেন্টাভ্যালেন্ট বা ডিপিটি টিকা নিয়ে থাকে কিন্তু বুস্টার টিকা না নিয়ে থাকে এবং কেটে স্থান অতিমাত্রায় মাটি বা অন্যান্য ময়লাযুক্ত বস্তুর সংস্পর্শে আসে, তবে তাকে ১ ডোজ টিটি টিকার পাশাপাশি ১ ডোজ Tetanus Immune Globulin বা টিআইজি টিকাও নিতে হবে। এক্ষেত্রে বুস্টার টিকা দেয়া থাকলেও টিআইজি টিকা নেয়া উচিত। টিটি ও টিআইজি নেয়ার জন্য অবশ্যই আলাদা হাত বা পায়ের মাংসপেশী ব্যবহার করতে হবে, একই হাতে বা পায়ে দেয়া যাবে না।
- যদি কোন ব্যক্তির পূর্ববর্তী টিকাদানের ইতিহাস অজানা থাকে এবং তার শরীরের কোন স্থান যদি পুরনো, মরচে-ধরা ধাতব বস্তু দিয়ে কেটে যায় বা পরিষ্কার, ধারালো যন্ত্র (ব্লেড, ছুরি, কাঁচি) দিয়ে কেটে যাওয়ার পর কাটা অংশ মাটির সংস্পর্শে আসে, তাহলে তাকে ১ ডোজ টিটি ও ১ ডোজ টিআইজি টিকা নিতে হবে।

চিত্রঃ টিকা দান

টাইফয়েড (Typhoid) রোগের টিকা ঃ

Salmonella typhi নামক ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সংঘটিত টাইফয়েড একটি মারাত্মক রোগ। ঠিকমত চিকিৎসা না পেলে অনেক সময় আক্রান্ত ব্যক্তির জীবন সংশয় হতে পারে। পৃথিবীতে বছরে প্রায় ১ কোটি ৬০ লাখ মানুষ টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হয় এবং প্রায় ৬ লাখ লোক টাইফয়েড রোগে মারা যায়। বাংলাদেশেও এই রোগের প্রকোপ অনেক বেশি। টাইফয়েড রোগের টিকা দু'ভাবে দেয়া যায়- মুখে ও ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে। টিকা নিয়ে মাধ্যমে টাইফয়েড রোগ হতে পুরোপুরি সুরক্ষা পাওয়া যায় না। টিকার মাধ্যমে এই রোগ প্রতিরোধের হার ৫০-৮০%।

৬ বছর বা তার বেশি বয়সীদের মুখে খাওয়ার টিকা দেয়া যায়। ১ দিন পর পর ১টা করে মোট ৪ টি ক্যাপসুল খেতে হয়। ৫ বছর পর পর বুস্টার ডোজ নেয়া যায়। ২ বছর বা তার অধিক বয়সীদের ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে টিকা দেয়া যায়। এক্ষেত্রে মাত্র ১ টি ডোজ নিতে হয়। ৫ বছর পর পর বুস্টার ডোজ নেয়া যায়।

এমএমআর (MMR) টিকা ঃ

হাম, মাম্পস ও রুবেলা - এই তিনটি রোগের টিকা একত্র করে দেয়া যায়। এই টিকার নাম এমএমআর টিকা। ১২-১৩ মাস বয়সী শিশুদের ১ম ডোজ দেয়ার পর স্কুলে প্রবেশের সময় (৩ বছর ৪ মাস হতে ৫ বছরের মধ্যে) আরেকটি বুস্টার টিকা দেয়া হয়। টিকা দেয়ার পর টিকার স্থানে সামান্য লাল, ফোলা এবং ব্যথা হতে পারে। টিকা দেয়ার পর সামান্য জ্বর, অস্থিরতা ও সামান্য দানা দেখা দিতে পারে। কোনো চিকিৎসার প্রয়োজন নেই।

মেনিনজোকক্কাস (Meningococcus) ব্যাকটেরিয়ার টিকা ঃ

Neisseria meningitidis নামক ব্যাকটেরিয়াটি মেনিনজোকক্কাস নামেও পরিচিত। এটি মস্তিষ্ক ঝিলীর প্রদাহ (Meningitis) ও রক্তে সংক্রমণ (Septicemia) - নামক প্রাণঘাতী দুটি মারাত্মক রোগের জন্য দায়ী। সব বয়সী লোকেরা এই ব্যাকটেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হলেও শিশু-কিশোরদের মৃত্যুর হার বেশি।

২- ৫৫ বছরের মধ্যে যে কোন সময় ১ম ডোজ মেনিনজোকেক্কাসের টিকা নেয়া যায়। তবে ২- ৬ বছরের মধ্যে ১ম ডোজ টিকা নিলে ৩ বছর পর ২য় ডোজ টিকা নিতে হয়। আর যদি ১ম ডোজ ৭ বছরের পর নেয়া হয় তবে ২য় ডোজ টিকা ৫ বছর পর নিতে হয়। এই টিকা ৮৫-১০০% ক্ষেত্রে রোগ প্রতিরোধ করতে পারে।

নিউমোকক্কাস (Pneumococcus) ব্যাকটেরিয়ার টিকা ঃ

Streptococcus pneumoniae ব্যাকটেরিয়াটি নিউমোকক্কাস নামেও পরিচিত। এই ব্যাকটেরিয়া মানুষের নাকের ছিদ্র ও গলার ভেতর বসবাস করে। এটি তার অবস্থান হতে বিচ্যুত হয়ে শরীরের বিভিন্ন স্থানে সংক্রমণ তৈরি করে। সাইনোসাইটিস, ওটাইটিস মিডিয়া, নিউমোনিয়া, মেনিনজাইটিস ইত্যাদি রোগের জন্য Pneumococcus অনেকাংশে দায়ী। এই ব্যাকটেরিয়ার অনেকগুলো সেরোটাইপ আছে।

7-valent, 10-valent, 13-valent, 23-valent ইত্যাদি বিভিন্নধরণের নিউমোকক্কাসের টিকা পাওয়া যায়। শিশুদের বেলায় আগে 7-valent টিকা ব্যবহার করা হলেও বর্তমানে প্রাপ্তিসাপেক্ষে 13-valent টিকা ব্যবহার করা হয়। বৃদ্ধ বয়সে এবং বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে শিশুদের বেলায় 23-valent টিকা ব্যবহার করা হয়।

২ মাস হতে ৫ বছর বয়সী শিশুদেরকে ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে 7-valent অথবা প্রাপ্তি সাপেক্ষে 13-valent টিকা দেয়া যায়। ২ মাস, ৪ মাস ও ৬ মাস বয়সে ৩ টি টিকা দেয়ার পর ১২-১৫ মাসের মধ্যে ৪র্থ (বুস্টার) ডোজ দিতে হয়।

তথ্যসূত্র

❑ স্কয়ার

শিশুদের রক্তস্বল্পতা

বাংলাদেশ ও পৃথিবীর অন্যান্য স্বল্পোন্নত ও অনুন্নত দেশে শিশুদের অন্যতম প্রধান স্বাস্থ্যসমস্যা হচ্ছে রক্তস্বল্পতা। এই সমস্যায় আক্রান্ত শিশুদের রক্তে হিমোগ্লোবিন বা লোহিত রক্ত কণিকা বা উভয়টি স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে কমে যায়। এটি শিশুদের মানসিক ও শারীরিক বিকাশের অন্যতম প্রধান অন্তরায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, সরকার ও বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থার অনেক চেষ্টার পরও শিশুদের রক্তস্বল্পতা দিন দিন বেড়েই চলছে।

বয়সভেদে শিশুদের রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রার তারতম্য হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে ৬-৫৯ মাস বয়সী শিশুদের রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা 11 g/dL এর চেয়ে কম হলে তাকে রক্তস্বল্পতা বলে। তেমনি ৫-১১ বছর বয়সীদের রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা 11.5 g/dL এর চেয়ে কম এবং ১২ বছর বা বেশি বয়সীদের রক্তে হিমোগোবিনের মাত্রা 12 g/dL এর চেয়ে কম হলে তাকে রক্তস্বল্পতা বলে।

রক্তস্বল্পতার কারণ

বিভিন্ন কারণে শিশুদের রক্তস্বল্পতা হতে পারে। তবে প্রধান কারণগুলো নিম্নরূপঃ

- বিভিন্ন খনিজ পদার্থের অভাব (আয়রন, কপার, ম্যাঙ্গানিজ ইত্যাদি)
- ভিটামিনের অভাব (ফলিক এসিড, ভিটামিন বি-১২, ভিটামিন সি)
- অপুষ্টি
- কৃমির সংক্রমণ (Hookworm)
- অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ (অতিরিক্ত রজস্রাব, পাইলস)
- বিভিন্ন রক্তরোগ (লিউকেমিয়া, লিম্ফোমা, অ্যাপ্লাসটিক অ্যানিমিয়া, থ্যালাসেমিয়া, হিমোফিলিয়া, হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া)
- বিভিন্ন সংক্রামক রোগ (যক্ষা, ম্যালেরিয়া, কালা জ্বর)
- কিডনীর ও থাইরয়েডের বিভিন্ন জটিলতা

এসব কারণের মধ্যে আমাদের দেশে আয়রনের অভাব, অপুষ্টি ও কৃমির কারণেই অধিকাংশ রক্তস্বল্পতার সৃষ্টি হয়।

রক্তস্বল্পতার লক্ষণসমূহ

- শরীর ফ্যাকাসে হয়ে যাওয়া
- শারীরিক দুর্বলতা ও শ্বাসকষ্ট হওয়া
- শরীরের ওজন হ্রাস পেতে পারে
- বুক ধড়ফড় করা ও নাড়ির গতি বেড়ে যাওয়া
- পেট ফুলে যেতে পারে ও ব্যথা হতে পারে
- শরীরের কোথাও কোথাও গুটি দেখা দিতে পারে
- কিছু কিছু ক্ষেত্রে শরীরের বিভিন্ন স্থানে ব্যথা হতে পারে
- অনেক সময় জন্ডিস হতে পারে

পরীক্ষা-নিরীক্ষা

সাধারণ রক্ত পরীক্ষার (Complete Blood Count) মাধ্যমে রক্তস্বল্পতার উপস্থিতি নির্ণয় করা যায়। তবে রক্তস্বল্পতার সঠিক চিকিৎসার জন্য এর কারণ জানা প্রয়োজন। এজন্য চিকিৎসকবৃন্দ আরও কয়েকটি পরীক্ষা করাতে পারেন। এসব পরীক্ষার মধ্যে Peripheral Blood Film (PBF), Hemoglobin Electrophoresis, Serum Iron Profile, Bone Marrow Test, Reticulocyte Count, Bilirubin ইত্যাদি। এর পাশাপাশি অনেক সময় কিডনী ও থাইরয়েড গ্রন্থির জটিলতা নির্ণয়ের জন্যও পরীক্ষা করানো হয়।

চিত্রঃ রক্তস্বল্পতা প্রতিরোধে উপযুক্ত খাবার

রক্তস্বল্পতার চিকিৎসা

রক্তস্বল্পতার কারণ নির্ণয় করে চিকিৎসা দেয়াই উত্তম। এতে চিকিৎসার সফলতা সবচেয়ে বেশি। তবে অনেক সময়ই আয়রন ও বিভিন্ন ভিটামিন দিয়ে চিকিৎসা শুরু করা হয়। এতে ফল না পাওয়া গেলে বিভিন্ন পরীক্ষা করে কারণভিত্তিক চিকিৎসা দিতে হবে।

রক্তস্বল্পতা প্রতিরোধের উপায়

- রক্তস্বল্পতার ব্যাপারে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা। শিশুদের সচেতন করার জন্য পাঠ্যবইয়ে রক্তস্বল্পতার কারণ ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করা।
- কৌটাজাত খাবারের বদলে শিশুদেরকে বেশি বেশি সবুজ ও রঙিন শাক-সবজি, ডিম, দুধ, মাছ-মাংশ এবং সর্বোপরি সুষম খাবার খাওয়ানো
- নিয়মিত বিরতিতে শিশুদের কৃমির ওষুধ খাওয়ানো
- শিশুদের কোন অসুখ হলে শীঘ্র তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা

তথ্যসূত্র

❑ স্কয়ার

ফিলওয়েল কিড্স

মাল্টিভিটামিন সিরাপ

উপাদান

প্রতি ৫ মি.লি সিরাপে আছে-

কড্ লিভার অয়েল	বিপি	১০০ মি.গ্রা.
ভিটামিন এ	বিপি	২০০০ আই.ইউ.
ভিটামিন ডি	ফা.গ্রেড	২০০ আই. ইউ.
ভিটামিন সি	বিপি	১৭.৫০ মি.গ্রা.
ভিটামিন বি১	বিপি	০.৭০ মি.গ্রা.
ভিটামিন বি২	বিপি	০.৮৫ মি.গ্রা.
ভিটামিন বি৬	বিপি	০.৩৫ মি.গ্রা.
ভিটামিন ই	ইউএসপি	১.৫০ মি.গ্রা.
নিকোটিনামাইড	বিপি	৯ মি.গ্রা.

ফার্মাকোলজি

ফিলওয়েল® কিড্স - বিভিন্ন ভিটামিনের একটি অনন্য সমন্বয় যা শিশুদের জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুতকৃত।

ফিলওয়েল® কিড্স -এ আছে কড্ লিভার অয়েল যা ভিটামিন এ ও ডি এর একটি প্রাকৃতিক উৎস। এছাড়া এটি দুষ্প্রাপ্য ইকোসাপেন্টাইনোয়িক এসিড ও ডোকোসাহেক্সাইনোয়িক এসিড এর একটি বিশেষ উৎস। এরা অতি প্রয়োজনীয় ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড তৈরী করে। এই এসিডগুলি সিরাম ট্রাইগ্লিসারাইড এর পরিমান কমায় এবং দেহের অভ্যন্তরে রক্ত জমাটে বাঁধা প্রদান করে। ফলে দেহে সুস্থ রক্ত সঞ্চালন অব্যাহত থাকে।

শরীরকে সুস্থ ও স্বাভাবিক রাখা ছাড়াও কড্ লিভার অয়েল, দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় - বিশেষ করে বিভিন্ন জীবাণু সংক্রমণজনিত রোগ যেমন- কাশি, বুক ও ফুসফুসের বিভিন্ন সমস্যা।

ভিটামিন এ দেহের বৃদ্ধি ছাড়াও সুস্থ চর্ম, চুল এবং নখের জন্য প্রয়োজনীয়। এটি সুস্থ ও স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তির জন্য অতি প্রয়োজনীয়।

বি-ভিটামিনগুলির কার্যকারিতা প্রায় একই রকম। এরা দেহের বিভিন্ন এনজাইম সিস্টেমে কাজ করে।

ভিটামিন সি দেহের সুস্থ বৃদ্ধিতে কার্যকরি ভূমিকা পালন করে। এটি দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং খাদ্য থেকে লৌহের শোষনে সাহায্য করে।

ভিটামিন ডি সুস্থ হাড় ও দাঁতের জন্য অতি আবশ্যক। এটি দেহে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস এর শোষনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ভিটামিন ই একটি প্রাকৃতিক এন্টিঅক্সিডেন্ট এবং এটি দেহকে ফ্রি-র‍্যাডিক্যালের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। এটি দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ও হৃদপিন্ডের স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা অব্যাহত রাখে।

নির্দেশনা

শিশু ও বয়স্কদের বিভিন্ন ভিটামিনের অভাবজনিত উপসর্গে নির্দেশিত।

ফিলওয়েল® কিড্স সিরাপ- রুচি বর্ধক এবং পাচন সহায়ক। **ফিলওয়েল® কিড্স** সিরাপ সুস্থ চুল, চর্ম, নখ, দৃষ্টি, হাড় ও দন্ত গঠনে সহায়ক। **ফিলওয়েল® কিড্স** সিরাপ সুস্থ মাংসপেশী ও সুস্থ স্নায়ূতন্ত্র গঠনে আবশ্যক। এটি মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বাড়ায়।

মাত্রা ও ব্যবহার বিধি

বাচ্চাদের ক্ষেত্রে (বয়স ১ মাস বা তার বেশী):

প্রতিদিন অর্ধেক চা চামচ দিয়ে (২.৫ মি.লি.) দিয়ে শুরু করতে হবে।

শিশুদের ক্ষেত্রে (বয়স ৬ মাস বা তার বেশী):

প্রতিদিন ২ চা চামচ (১০ মি.লি.)।

স্তন্যদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে এবং যারা গর্ভধারনে ইচ্ছুক:

প্রতিদিন ১ চা চামচ (৫ মি.লি.)।

সিরাপটি পানি বা দুধে মিশিয়েও পান করা যাবে।

গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ব্যবহার

নির্দেশিত।

শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার

নির্দেশিত।

সতর্কতা

দীর্ঘকাল ব্যবহারের ফলে ফ্যাটে দ্রবীভূত ভিটামিনগুলি 'হাইপার ভিটামিনোসিস তৈরী করতে পারে। সুতরাং চিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতীত অধিক মাত্রায় বা দীর্ঘকাল এটি ব্যবহারের করা ঠিক নয়।

প্রতি নির্দেশনা

যাদের এই ওষুধের কোন উপাদানের প্রতি অতি সংবেদনশীলতা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে এটি নির্দেশিত নয়।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া

সিরাপটি সাধারণত সুসহনীয়।

ড্রাগ ইন্টার‍্যাকশন

তেমন কোন ড্রাগ ইন্টার‍্যাকশন দেখা যায় নি।

ফার্মাসিউটিক্যাল সতর্কতা

আলো থেকে দূরে, ঠান্ডা স্থানে (৩০০ সে. তাপমাত্রার নীচে) রাখুন।

সরবরাহ

ফিলওয়েল® কিড্স সিরাপ ১০০ মি.লি. : প্রতিটি বোতলে আছে ১০০ মি.লি. সিরাপ এবং সাথে একটি পরিমাপক চামচ।

ফিলওয়েল® কিড্স সিরাপ ২০০ মি.লি. : প্রতিটি বোতলে আছে ২০০ মি.লি. সিরাপ এবং সাথে একটি পরিমাপক চামচ

তথ্যসূত্র

❑ স্কয়ার

পরিবারের সমস্যা কোষ্ঠকাঠিন্য যখন,
Glysup™ Suppository সমাধান তখন

শিশুদের জন্য

Glysup™ 1.15 Suppository

Glycerin BP 1.15 gm

&

প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য

Glysup™ 2.30 Suppository

Glycerin BP 2.30 gm

দিনে ১টি করে সাপোজিটরি

বুক জ্বালাপোড়া ও গ্যাসের সমস্যার দ্রুত সমাধানে ...

Maganta™ Plus

Magaldrate USP and Simethicone USP

চিনিমুক্ত

সাসপেনশন
ও
চুষে খাবার ট্যাবলেট

Since 1958

SQUARE
PHARMACEUTICALS LTD.
BANGLADESH

www.squarepharma.com.bd
facebook.com/SquarePharmaLtd
twitter.com/SquarePharmaBD

SQUARE

দৈনন্দিন সমস্যা কোষ্ঠকাঠিন্য যখন দ্রুততর সমাধানে Duolax™ তখন ...

Duolax™

Magnesium Hydroxide & Liquid Paraffin

The DUAL ACTION Laxative

THE AGA INSTITUTE

According to American Gastroenterological Association

ঔষধ	কাজ শুরু করে (ঘন্টায়)
ল্যাকটুলোজ	২৪-৪৮
সরবিটল	২৪-৪৮
ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্সাইড ও লিকুইড প্যারাফিন (Duolax™)	১-৩

Duolax™ অন্যান্য কোষ্টকাঠিন্যের ঔষধের চেয়ে দ্রুত কাজ করে

Since 1958

SQUARE PHARMACEUTICALS LTD. BANGLADESH

www.squarepharma.com.bd

facebook.com/SquarePharmaLtd

twitter.com/SquarePharmaBD

SQUARE

মেডিকেল সার্ভিসেস বিভাগ, স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড, কর্পোরেট হেড কোয়ার্টার্স: স্কয়ার সেন্টার
৪৮, মহাখালী বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১২, ফোন : ৮৮৩৩০৪৭-৫৭, ৮৮৫৯০০৭ ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৮৮২ ৮৬০৮, ৮৮২ ৮৬০৯
E-mail : info@squaregroup.com, Web : http://www.squarepharma.com.bd
Production Rains.com